বাতায়ন
বসন্ত

Lyra Mukherjee Chicago, USA

নীল দিগন্তে –
ওই ফুলের আগুন লাগল

বাতায়ন

সম্পাদনা

রঞ্জিতা চট্টোপাধ্যায়

তৃতীয় সংখ্যা, এপ্রিল ২০১৬

EDITORS
Ranjita Chottopadhyay, IL, USA
Jill Charles, IL, USA

COORDINATOR
Biswajit Matilal, Kolkata, India

DESIGN AND ART LAYOUT
Kajal & Subrata, Kolkata, India

PHOTOGRAPHY
Tirthankar Banerjee, Perth, Australia
Bishakha Dutta, Kolkata, India

PUBLISHED BY
Neo Spectrum
Anusri Banerjee, Perth, Australia
E-mail: a_banerjee@iinet.net.au

বাতায়ন পত্রিকা বাতায়ন কমিটি দ্বারা প্রকাশিত ও সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত । বাতায়ন কমিটির লিখিত অনুমতি ছাড়া, এই পত্রিকায় প্রকাশিত যে কোন অংশের পুনর্মুদ্রণ বা যে কোন ভাবে ব্যবহার নিষিদ্ধ । রচনায় প্রকাশিত মতামত সম্পূর্ণ ভাবে রচয়িতায় সীমাবদ্ধ ।

Published by the BATAYAN of Neo Spectrum, Perth, Australia. No part of the articles in this issue can be re-printed without the prior approval of the publisher. The editors are not responsible for the contents of the articles in this issue. The opinions expressed in these articles are solely those of the contributors and are not representative of the Batayan Committee.

বাতায়ন

সূচীপত্র

Bangla Section

অ-সাধারণ ২
সুজয় দত্ত, Cleveland, USA

স্থানীয় ট্রেন ও জানালার ধার ৫
রঞ্জিতা চট্টোপাধ্যায়, Chicago, USA

বন্দী ৭
ধীমান চক্রবর্তী, Chicago, USA

রাত্রিলিপি ৮
ধীমান চক্রবর্তী, Chicago, USA

যদি ৯
শৈবাল তালুকদার, Chicago, USA

উইদাউট আ প্রিফেস ১০
ইন্দ্রানী দত্ত, Sydney, Australia

গোরস্থানে হেমন্তের বিকেল ১৭
আনন্দ সেন, Ann Arbor, USA

লিমেরিক ১৮
শুভ্র দত্ত, Seattle, USA

শোওন ১৯
শাশ্বতী ভট্টাচার্য, Madison, USA

মন চায় ২২
অনিতা মুখোপাধ্যায়, Kolkata, India

পাঞ্জাবের দুই ঝলক ২৩
স্বপ্না ব্যানার্জী, Mentor, USA

English Section

Two Rooms ২৮
Viola Lee, Chicago, USA

The Bee ২৯
Jill Charles, Chicago, USA

Supernatural ৩২
Tinamaria Penn, Chicago, USA

My Spoon (Inspired by Mayi Ojisua) ৩২
Tinamaria Penn, Chicago, USA

Uma'r Maya ৩৩
Priya Chakraborty, Sydney, Australia

Stolen (A play in one act) ৩৪
Abhijit Mukherjee, Perth, Australia

Sikkim ৪১
Shravani Datta, Chicago, USA

Amazing Art of Dokra ৪৫
Bishakha Dutta, Kolkata, India

Koshe Kosha ৪৭
Balarka Banerjee, Sydney, Australia

Youngest Publisher of Publisher Guild Kolkata ৫০
Esha Chatterjee

Acknowledgement:

Thank you to all the contributors to our third issue of 'BATAYAN'. We also thank every one for being with us, trusting us and providing us moral support. Your overwhelming response and comments are leading us to challenging 2016. We could not have done it without your support.

Batayan Team

বাতায়নের প্রথম মুদ্রিত সংখ্যা আপনারা পাবেন জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে । এই সংখ্যায় থাকবে এ যাবৎ প্রকাশিত গল্প, কবিতা, রম্যরচনা, ভ্রমণকাহিনীর নির্বাচিত সংকলন এবং আরও নানাবিধ নতুন লেখা । আপনার সংগ্রহে সংখ্যাটি রাখতে চাইলে নিচের ই-মেলের যে কোন একটিতে যোগাযোগ করুন —

c_ranjita@yahoo.com
a_banerjee@iinet.net.au

সম্পাদকীয়

‘এল ঐ বনান্তে পাগল বসন্ত’

রোদে লেগেছে রেশমী উষ্ণতার ছোঁয়া। বাড়ছে দিনের দৈর্ঘ্য। ভোরবেলা ঘুম ভেঙে গেলে শোনা যাচ্ছে পাখীদের কিচির মিচির। আমাদের পাড়ায় ঢোকার মুখে যে ছোট্ট জলাশয়টি আছে সেদিন দেখি সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে একজোড়া কানাডিয়ান রাজহাঁস। ঘর বাঁধার নিশ্চিন্ত জায়গা খুঁজছে তারা। কিছুদিনের মধ্যেই জলাশয়টির আশেপাশে ঘুরে বেড়াবে তাদের ছোট্ট ছোট্ট ছানারা। প্রকৃতির রাজত্বে নতুন প্রাণের আগমনবার্ত্তা সুনিশ্চিত এবং নিয়মিত। তাই সুনিশ্চিত বসন্তের আগমনও। সে আসে প্রত্যেক বছরে। আসে বছরের একটা নির্দিষ্ট সময়ে। কিন্তু তা সত্ত্বেও বসন্তের আগমন কখনও নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনায় পর্যবসিত হয় না। তার কারণ প্রত্যেকবারই সে আসে নতুন নতুন রূপে। আমাদের ‘অবগুণ্ঠিত কুণ্ঠিত জীবনে’ আমরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকি তার জন্য। সে আসে মহা সমারোহে। শীতের রুক্ষতা জীর্ণতা দূর করে পৃথিবীকে সে পূর্ণ করে তোলে ‘প্রাণের লাবণ্যে।’ আর সেই সঙ্গে বহন করে আনে বেঁচে থাকার, বাঁচিয়ে রাখার প্রতিশ্রুতি।

বসন্ত ভালবাসার ঋতু। বিভেদ বিদ্বেষ ভুল বোঝাবুঝি দূরে সরিয়ে সকলকে কাছে টেনে নেওয়ার সময় এখন। ভারতবাসীর রঙের উৎসব হল হোলি। হোলির আবীর মুছে যায় উৎসব তিথির শেষে। লেগে থাকে শুধু ভালবাসার রঙ। আর সেই রঙেই ‘মনে মনে লাগে হোলি’। মানুষের জন্য মানুষের প্রেম, ভালবাসা, শ্রদ্ধা, মমতা জাতি ধর্মের গণ্ডী মানে না। নির্বিচারে আপন করে নেয় সকলকে। দেশ ও ভাষার সীমানা ছাড়িয়ে সব রকমের লেখক পাঠককে কাছে টেনে নেওয়ার ক্ষুদ্র প্রয়াস আমাদের বাতায়নের।

বসন্ত রঙেরও ঋতু। সে রঙ কি শুধু ফুলের পাপড়িতে আর আবীরে ? সে রঙ কি শুধু মনেই ছড়ায় ? নাকি ছড়িয়ে যায় আরও গভীরে যেখানে চোখের দৃষ্টি পৌঁছতে অপারগ ? ‘রঙ যেন মোর মর্মে লাগে’। সেই মর্মের রঙ ভাষা হয়ে, ভাব হয়ে, ছবি হয়ে কখনও বা ছন্দ হয়ে যখন বেরিয়ে আসে তখন মনে হয় না কি ‘ওলো সই, আমার ইচ্ছা করে তোদের মতো মনের কথা কই’ ?

আপনারা প্রাণভরে বলুন মনের কথা। আমরা আছি আপনাদের সে কথা কান পেতে শোনার জন্য। এসেছি বাতায়নের ‘বসন্ত’ সংখ্যা নিয়ে। আপনাদের মনের জানালা খুলে দেখে নিন আপনার মতো আরও অনেকে খোলা জানালা দিয়ে কি দেখেছেন গত কয়েক মাসে। আশা করি আপনিও উৎসাহিত হবেন মনের জানালা খুলতে। ‘আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে’। ‘বাতায়ন’ না খুলে উপায় আছে কি ?

সকলে ভাল থাকবেন। আনন্দে থাকবেন। ‘বাতায়ন’ পত্রিকার পক্ষ থেকে সকলের জন্য রইল বাসন্তিক শুভেচ্ছা।

রঞ্জিতা চট্টোপাধ্যায়
শিকাগো, ইলিনয়

অ-সাধারণ

সুজয় দত্ত

উঁহু, উঁহু, ভুলেও ঐ ভুলটি করবেন না ! পাতা উল্টে অন্য পাতায় চলে যাবেন না ! মনে রাখবেন, আমাদের এই অসাধারণ পত্রিকায় বেরোনো আমার এই অসাধারণ লেখাটি পড়ার সৌভাগ্য কিন্তু সাধারণ মানুষের হবেনা । সেদিক দিয়ে ভাবলে আপনিও অসাধারণ । দেখুন, আজকাল 'অসাধারণ', 'অসামান্য', 'অনবদ্য' — এসব না হলে চলেনা । ওগুলো হল, যাকে বলে, অস্তিত্বের ন্যূনতম শর্ত । যেমন ধরুন আপনি ম্যাট্রিমনি কলামে আপনার ছেলে বা মেয়ের জন্য যখন পাত্রপাত্রীর বিজ্ঞাপন দেন, 'একজন চলনসই চেহারার সাধারণ গুণসম্পন্না পাত্রী চাই' বা 'একজন মোটামুটি শিক্ষিত সামান্য মাইনের চাকুরিওয়ালা পাত্র চাই' — এরকম লেখেন কি ? না সুপারলেটিভ ঢেলে দেন ? পকেটে মাল্লু থাকলে বাজারে কেনাকাটার সময় কি মাঝারিমানের কোম্পানির তৈরী যেমনতেমন গুণমানের জিনিস খোঁজেন ? বৈদ্যুতিন প্রচারমাধ্যমে এমন একটা কমার্শিয়াল দেখাতে পারবেন যেখানে স্বর্গের পারিজাত আর সমুদ্রমন্থনে ওঠা অমৃত ছাড়া কিছু বিক্রি করছে ? এমনকী যে দেশের সংস্কৃতি ছোটবেলা থেকে শেখায় 'আপনারে বড় বলে — বড় সে তো নয়, লোকে যারে বড় বলে বড় সেই হয়' আর 'সকল অহংকার আমার ডুবাও চোখের জলে', তারই প্রশস্তি গাইতে গিয়ে আমরা বলি 'সারা জাহাঁসে আচ্ছা হিন্দুস্তাঁ হামারা' আর 'সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি' । এটাকে নাহয় দেশপ্রেমের আবেগজনিত অতিকথন বলে তাও চালিয়ে দেওয়া যায় । কিন্তু মার্কিন মুলুকে পা দেওয়া ইস্তক 'দ্য গ্রেটেস্ট', 'দ্য বিগেস্ট', 'দ্য রিচেস্ট' আর 'দ্য বেস্ট' শুনতে শুনতে অতি-বিনয়ীও দুদিনেই শিখে যায় জীবন-টুর্নামেন্টের অমোঘ নিয়ম — হয় গলায় আত্মগরিমার জয়ঢাক ঝুলিয়ে দুহাতে পেটাও নয়তো কাঁচকলা হাতে সাইডলাইনে গিয়ে বোসো । আমরা যারা দেশে থাকতে প্রকৃতিদত্ত এগারো নম্বর বাসে বা সাইকেল ঠেঙিয়ে যাতায়াত করতাম, তারাই পাশ্চাত্যের উন্নত দেশগুলোয় এসে হঠাৎ করে গাড়ী কিনে ফেলায় আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবেরা চোখ টাটালে তাদের কী বলতাম, মনে আছে নিশ্চয়ই । বলতাম, ওসব দেশে গাড়ীটা 'লাক্সারি' নয়, 'নেসেসিটি' । ঠিক ঐ কথাই প্রযোজ্য নিজের ট্যাঁড়া পেটানোর ব্যাপারেও । স্টার-স্প্যাংগ্‌লড্ ব্যানারের দেশে ওটা একটা 'নেসেসিটি' । সবার মাথা ছাড়িয়ে ওপরে উঠতে গেলে, নজরে পড়তে গেলে ভীড়ের মধ্যে দুহাত তুলে চীৎকার করতে হবে 'আমি আমি আমি' । নিজের যা কিছু ভাল, যা কিছু পাতে দেবার মতো, সেসব বাক্সবন্দী করে আপনি পর্দার আড়ালে চক্ষুলজ্জার ঘোমটা টেনে বসে থাকবেন আর লোকে এসে সার্চলাইট ফেলে আপনাকে খুঁজে নিয়ে গিয়ে ভিক্‌ট্রি স্ট্যান্ডে বসাবে — এ আশা পরপর দুবার লটারিতে জ্যাকপট জেতার আশার চেয়েও অলীক । সুতরাং আর দেরী করে লাভ কী ? তুলে নিন হাতে লাউড স্পীকার —

কী হল, কথাটা মন থেকে মানতে পারলেন না ? আচ্ছা, কখনো তলিয়ে ভেবে দেখেছেন কি বিনয় কেন ভাল গুণ আর আত্মশ্লাঘা কোন্ অর্থে অবাঞ্ছিত ? ধরা যাক আপনার প্রতিবেশী আর চেনা-পরিচিতদের ন্যানো আর মারুতির ভীড়ে আপনি একাই মার্সিডিজ চড়েন । কিংবা পাড়াশুদ্ধ সব উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর সাধারণ রেজাল্টের মধ্যে আপনার ছেলে বা মেয়ে প্রথম কুড়িতে স্ট্যান্ড শুধু করেনি, জয়েন্ট এন্ট্রান্সেও ইঞ্জিনিয়ারিং-এ প্রথম দশে । গর্বে আপনার ছাতি ফুলে রয়েছে, অথচ মুখে তা প্রকাশ করায় অলিখিত নিষেধাজ্ঞা । আপনাকে বিনয়ের পরাকাষ্ঠা হয়ে বলতে হবে, 'না না, ও আর এমন কী, ও তো সামান্য ব্যাপার' । না হলেই লোকসমাজে অহংকারী, দাম্ভিক, হামবড়া ইত্যাদি বিশেষণের শিরোপা । কিন্তু 'ওটা তেমন কিছু নয়, সামান্য ব্যাপার' — এই কথাটা তো ডাহা মিথ্যে ! হে ন্যায়নীতিবিদ্ পন্ডিতমশায়েরা, আপনাদের হিতোপদেশের ঝুলিতে 'কদাচ মিথ্যা বলিও না' — এটাও আছে না ? এর উত্তরে হয়তো বলা হবে, আহা, সবকিছুকে অত আক্ষরিক অর্থে নিও না । তোমাকে তো আর 'আমি ঠেলাগাড়ী চড়ি' বা 'আমার ছেলে

ফেল করেছে' – এমন বলতে বলা হচ্ছেনা। আসল সত্যিটাই বল, কিন্তু একটু যেন অনিচ্ছাসত্ত্বে, একটু ভলিউম্‌টা কমিয়ে। তাতে আশপাশের লোকেদের হীনম্মন্যতার কাটা ঘায়ে নুনের ছিটেটা একটু কম লাগবে আর তোমার বিনয়ের চিনির প্রলেপে মুগ্ধ হয়ে তারা তোমাকে আরো বেশী সাধুবাদ দেবে। অর্থাৎ সোজা কথায়, সোনার মেডেলে বিনয়ের সোহাগা লাগালে মেডেলটাই আরো চকচক করে। এ যেন সেই, 'পূজোপার্বণে সারাদিন উপোস করে থাকিস কেন ?' না, 'তাহলে রাতের লুচি-মাংসটা আরো ভাল জমে'। অতএব কী দাঁড়াল ? বিনয় একটা বাস্তববাদী স্ট্র্যাটেজি মাত্র ? তা যদি হয়ও, সেই স্ট্র্যাটেজির কার্যকারিতার মেয়াদ বোধহয় এখন ফুরিয়েছে। বর্তমান সমাজে দাতা বা গ্রহীতা – কোনো পক্ষেরই ওটা আর তেমন কাজে আসেনা। আজকাল দামী বিদেশী গাড়ী বা ছেলেমেয়েদের তারকাখচিত রেজাল্ট নিয়ে আপনি যদি বিনয় দেখান, লোকে উল্টে আড়ালে বলাবলি করবে 'ব্যাটার কালোবাজারী আর ঘুষের টাকাতেই বোধহয় এত রমরমা, তাই গাড়ী নিয়ে ফুটানি মারার সাহস নেই' কিংবা 'বাড়ীতে একগন্ডা প্রাইভেট টিউটর রাখলে আর হাজার হাজার টাকার টেস্ট প্রিপারেশন কোর্স করালে আমাদের ছেলেমেয়েরাও ঐরকম রেজাল্ট করত, সেটা জানে বলেই ন্যাকামি করছে'। শুনে অন্য একটা হিতোপদেশ মনে পড়বে আপনার – 'অতি ছোট হয়ো না, ছাগলে নুয়ে খাবে'। আর আপনি যদি বিনয়ের রিসিভিং এন্ডে থাকেন, বুকে হাত দিয়ে বলুন তো, ঐটুকু চিনির প্রলেপে হারের জ্বালা জুড়োয় আপনার ? নুনের ছিটের চিড়বিড়ানি সত্যিই কমে ? আপনাকে টপকে প্রতিযোগিতায় সোনার মেডেল জিতে কেউ যদি বলতে আসে, 'না না, কী আর এমন খেললাম ?', মনে হয় না কি সে আপনার অক্ষমতাকে আরো বেশী বিদ্রূপ করছে, ভেতরে ভেতরে হাসছে আর বলছে 'হেরো পার্টি, হেরো পার্টি, যা গিয়ে চোষ আমের আঁটি' ? মনে হয় না কি, এর তো দেখি টুর্নামেন্টের মেডেল জিতেও খিদে মেটেনি, এখন আবার সৌজন্য-নম্রতার মেডেলটাও নিতে আসছে ? স্বীকার করছি, এই মনে হওয়া বা না হওয়াটা একান্তই আপনার মনের ব্যাপার। সবার অনুভূতি একরকম নয়। তবে সামগ্রিকভাবে যুগ বদলালে আর দৃষ্টিভঙ্গী বদলালে তার সঙ্গে মানুষের মনও তো বদলায়। আজকের এই সোশ্যাল মিডিয়ার দৌরাত্ম্য আর আর্থসামাজিক ইঁদুর-দৌড়ের নির্মমতার যুগে মধুতে মেড়ে দেওয়া বিনয়ের কবিরাজী ওষুধে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কেন 'প্লাসিবো এফেক্টও' পাওয়া যায়না জানেন ? কারণ ফেস্‌বুক-ট্যুইটার-হোয়াট্‌স্‌ অ্যাপের নিরন্তর খোঁচা বারবার আপনাকে অনিচ্ছুক গ্ল্যাডিয়েটরের মতো টেনে নিয়ে যায় তুলনার বধ্যভূমিতে। সেখানে আত্মপ্রচারের লড়াইয়ে হয় আপনাকে জিতে বেরোতে হবে, নয়তো বেরোবে আপনার আত্মসম্মানের মৃতদেহ। পালিয়ে বাঁচার রাস্তা নেই।

তাই বলছিলাম, আক্রমণই আত্মরক্ষার সেরা অস্ত্র। কাঁধে তুলে নিন আত্মগরিমার জয়ঢাক, তাতে আত্মপ্রচারের কাঠি পড়ুক। তিলকে তাল কেন, কাঁঠাল করতে শিখুন। নাহলে অন্যদের ফুলিয়ে তোলা পেল্লায় সাইজের তিলের পাশে আপনার আসল তালকে মনে হবে পাতিলেবু। নিজের যাকিছু জঘন্য, সেগুলোকে 'ভাল' আর যাকিছু চলনসই, সেগুলোকে 'বিশ্বসেরা' বলতে শিখুন। আজকাল এরই বাহারি নাম পজিটিভ থিংকিং। ঘাবড়াবেন না, স্বর্গ-নরকের অ্যাকাউন্ট্যান্ট চিত্রগুপ্তের খাতায় জলজ্যান্ত মিথ্যে বললে যে লালকালির দাগ পড়ে, সেটা কায়দা করে এড়িয়েই এসব করা যায়। আমেরিকা থেকে ধার করা এক মোক্ষম চালেই চিত্রগুপ্ত কাত। সে-দেশে ধরুন কেউ একটা পিৎজা বা পেস্ট্রির দোকান খুলল। প্রথমতঃ, শুরুতে সে খাবারের গুণমান আর উৎকর্ষের পিছনে যত খরচ করবে, প্রচারের জন্য করবে তার বহুগুণ। দ্বিতীয়তঃ, সেই দোকানের সাইনবোর্ডে, বিজ্ঞাপনে আর ওয়েব্‌সাইটে বড় বড় হরফে লেখা থাকবে 'আওয়ার পিৎজা (বা পেস্ট্রি) ওয়ান দ্য টপ্‌মোস্ট র‍্যাংকিং'। তার তলায় খুদে খুদে অক্ষরে বাক্যটা সম্পূর্ণ করা থাকবে, 'অ্যামং অল্‌ দ্য পিৎজা স্টোর্স (বা কন্‌ফেক্‌শনারিজ) ইউজিং লোকালি গ্রোন অর্গানিক ইনগ্রেডিয়েন্ট্‌স্‌ ইন্‌ অমুক সাবার্ব অফ তমুক সিটি'। কায়দাটা বুঝলেন না ? বুঝবেন, যদি খোঁজ নিয়ে দেখেন সেই তমুক সিটির অমুক সাবার্বে ওইরকম কটা পিৎজা স্টোর (বা কন্‌ফেক্‌শনারি) আছে। হয় আর একটাও নেই, অথবা আছে শুধু বড় বড় নেশন্‌ ওয়াইড্‌ চেন্‌গুলো যারা ঐ ধরণের ইনগ্রেডিয়েন্ট ব্যবহারই করে না। অর্থাৎ বিজ্ঞাপনে ফাঁকা মাঠে গোল দিয়ে বাহাদুরি দেখানো আর কি। তাছাড়া আজকাল মানুষের সময় আর মনোযোগের স্থায়িত্ব এত কম, ঐ খুদে হরফের লেখাটা কজনেরই বা নজরে পড়বে ? সুতরাং সাপও মরল, লাঠিও ভাঙল না। জানি এটা শুনে মহাভারতের কথা মনে পড়ছে। সেখানেও ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির দ্রোণকে 'অশ্বত্থামা হতঃ'টা বিজ্ঞাপনী ব্যানারের মতো ৭২ ফন্ট্‌সাইজে বলেছিলেন আর 'ইতি গজঃ'টা ফুটনোটের

মতো ১২ ফন্ট্সাইজে (যদিও উদ্দেশ্যটা আত্মপ্রচার ছিলনা) । তবে বলাই বাহুল্য, আমেরিকায় ফুট্নোট্টা চিত্রগুপ্তের ভয়ে বা ধর্মরক্ষার জন্য জোড়া হয়না, জোড়া হয় সেদেশের কড়া আইনকানুন আর ক্ষিপ্র বিচারব্যবস্থার রক্তচক্ষুকে মাথায় রেখে । যেসব দেশে আইনব্যবস্থায় সুইস্ চিজের মতো ফাঁকফোকর আর বিচারব্যবস্থা শামুকের চেয়েও শ্লথ, সেখানে চিত্রগুপ্ত (বা নাস্তিকদের ক্ষেত্রে নিজের বিবেক) ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করার দরকার নেই । তাহলে ভেবে দেখুন, আপনার কত প্রতিভা অন্ধকারে চাপা পড়ে রয়েছে স্রেফ আপনার পজিটিভ থিংকিং-এর অভাবে ! যেমন, আপনি একজন চ্যাম্পিয়ন সাঁতারু (মানে আপনার পরিবারের মধ্যে আরকি, কারণ আপনার বংশে আর দ্বিতীয় কেউ সাঁতার শেখেনি) আর একজন সেরা গায়ক (অন্ততঃ নিজের বাথ্রুমের চৌহদ্দিতে তো বটেই) । কী, ফেস্বুকে ছাড়ার মতো কিছু মালমশলা পেয়ে গেলেন তো ? সঙ্গে একটা সহাস্য সেল্ফি দিতে ভুলবেন না । নাহলে হাজার হাজার সেল্ফিতে 'অসামান্য' গুণসম্পন্ন সব মানুষের স্বঘোষিত কৃতিত্বের হাসিমুখ দেখতে দেখতে নিজেকে বড়ই সাধারণ মনে হবে ।

কী বলছেন, 'সাধারণ' তকমায় আপত্তি নেই আপনার ? দাঁড়ান দাঁড়ান, আপনি ভিন্গ্রহ থেকে আসেননি তো ? এই পৃথিবীর মানুষের তো ঐ শব্দটায় দারুণ অ্যালার্জি । জুন মাসের গরমে শীতের কোটের মতো গা থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারলে বাঁচে । ধরুন একজন এই সেদিন অবধি রাস্তায় ফ্যা-ফ্যা করে ঘুরে বেড়াত, এ-পার্টি সে-পার্টির হয়ে খুচরো রাজনৈতিক মস্তানি করত, হঠাৎ কোনো প্রভাবশালী রাজনৈতিক দাদার নজরে পড়ে গিয়ে মিউনিসিপ্যালিটির নির্বাচনে দাঁড়িয়ে কাউন্সিলর হয়ে গেল । অমনি সে মিডিয়ায় বিবৃতি দেবে, 'জনসাধারণের কাছে দায়বদ্ধ থেকে জনসাধারণের একজন হয়েই কাজ করতে চাই —' ইত্যাদি । আরে, তুই অসাধারণটা হলি কবে ? পার্টির সেই দাদার দরকার ফুরিয়ে গেলেই যখন অর্ধচন্দ্র দেবে, আবার তো পুনর্মুষিকো ভব । কিংবা ধরুন একজন অখ্যাত কবি, যার মাথামুন্ডুহীন ল্যাজামুড়োহীন আধুনিক কবিতা পাড়ার পত্রিকায় বা পুজোর স্যুভেনিরে বেরোত, কেউ তেমন পাত্তাও দিত না, সে হঠাৎ কোনো মোটামুটি নামী পত্রিকায় 'ব্রেক' পেয়ে গিয়ে একটা-দুটো কবিতা ছাপিয়ে ফেলতে পারলেই বলতে শুরু করবে, 'আমার কবিতা সাধারণ পাঠকের জন্য নয়, একটু অন্য লেভেলের' । ব্যস্, সাধারণত্বের ভীড় প্ল্যাট্ফর্ম ছেড়ে আসাধারণত্বের ট্রেনে হাতল ধরে ঝুলে পড়ল সে । হাতলটা পিছলে গেলে (পড়ুন ঐ পত্রিকার কবিতা বিভাগের সম্পাদক বদল হলে) তখন কী হবে ? সারাজীবন নটা-পাঁচটা করা সরকারী চাকুরে, যিনি চিরকাল বাসের লাইনে দাঁড়িয়ে গলদ্ঘর্ম হয়ে অফিস যেতেন, চারবার ব্যর্থ আবেদনের পর পাঁচবারের বার পদোন্নতিটা মঞ্জুর হতেই শেয়ারের ট্যাক্সিতে অফিস যাওয়া শুরু করলেন । সাধারণ পাব্লিকের মতো বাসে ঠাসাঠাসি করে যাওয়া নাকি আর পোষায় না ।

আসলে সাধারণত্ব জিনিসটা একটা সিঁড়ির মতো । তার ধাপ বেয়ে বেয়ে ওপরে উঠতে চাওয়া মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম । এই মুহূর্তে যে ধাপে রয়েছেন আপনি, তার নীচের সবকটা ধাপের সবাই আপনার কাছে সাধারণ । আবার স্বীকার করতে কষ্ট হলেও আপনার ওপরের ধাপের মানুষদের কাছে আপনি সাধারণ । মুশকিল হচ্ছে, এক ধাপ থেকে পরের ধাপে ওঠার প্রতিটি পদক্ষেপে মানুষ মনে মনে ভাবতে ভালবাসে সে 'অসাধারণ' হল । আর সাধারণত্ব থেকে তথাকথিত 'অসাধারণত্বে' তার এই কল্পিত মানসিক উত্তরণ একমুখী । আকস্মিক পদস্খলন হলে শরীরটা কয়েকধাপ হড়কে নেমে যায়, কিন্তু মন নামতে চায়না । ফলে তখন জমা হয় অসন্তোষ, হতাশা, চাপা ক্ষোভ আর চারপাশের সবকিছুর ওপর একটা সুগভীর বিরক্তিবোধ । এইজন্যই, স্রেফ এইজন্যই আজ পৃথিবীতে কত মানুষ অসুখী ।

আচ্ছা, এরকম না হয়ে আমরা সবাই যদি 'মাই ফেয়ার লেডির' প্রোফেসর হেন্রি হিগিন্স্ হতাম ? যদি প্রকাশ্যে, অসংকোচে, সগর্বে বলতে পারতাম, 'আই অ্যাম্ অ্যান্ অর্ডিনারী ম্যান' ? যদি বলতে পারতাম, হ্যাঁ আমি সাধারণ, আমি টয়োটা-হন্ডা-মার্সিডিজ নয়, বাসে চেপে অফিস যাই, কিন্তু কোনোদিন বাসের টিকিট ফাঁকি দিই না ! হ্যাঁ আমি সাধারণ, আমি পুজোর ছুটিতে সপরিবারে ব্যাংকক যাই না, বিষ্ণুপুর যাই, কিন্তু আমার নিজের সৎপথে রোজগার করা টাকায় — চোরাকারবারের কালো টাকায় নয় ! হ্যাঁ আমি সাধারণ, আমার মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানীতে লাখ টাকা মাসমাইনের চাকরি নয়, মামুলি সরকারী চাকরি, কিন্তু কোনোদিন কারো কাছে ঘুষ বা বেআইনি সুবিধা চাইনি ! তাহলে কেমন হতো বলুন তো এই পৃথিবীটা ? অসাধারণ — তাই না ?

জানালা দিয়ে

স্থানীয় ট্রেন ও জানালার ধার

রঞ্জিতা চট্টোপাধ্যায়

‘সরুন সরুন মশায়-আমরাও অনেকক্ষণ ধরে বাইরে ঠাণ্ডায় দাঁড়িয়ে আছি – আপনি সুড়ুৎ করে আমাদের পাশ কাটিয়ে আগে উঠে পড়লেন যে বড় ?’ কালো কোট, মাথায় টুপি হাতে দস্তানা পরা ভদ্রলোক হৈ হৈ করে উঠলেন । হিমশীতল ভোরের জমাট নৈঃশব্দ্য মুহূর্ত্তে খান খান । শিকাগো শহরতলীর একটি ট্রেন স্টেশন । জানুয়ারী মাস । স্থানীয় নিত্যযাত্রীরা তাদের নির্দিষ্ট ট্রেনটির আশায় অপেক্ষারত । ঘেঁষাঘেঁষি দাঁড়িয়ে সব । যেন অ্যান্টার্কটিকার পুরুষ পেঙ্গুইনদের কলোনি । অপরিচয়ের বাধা পার হয়ে যতটা কাছাকাছি আসা যায় আর কি ! উত্তুরে হাওয়ার দাপট থেকে বাঁচতে একটু উষ্ণতা হল প্রত্যাশা ।

আমার গলার স্বর এমনিতে মোটেই মিহি নয় । কিন্তু কারো কথার জোরাল উত্তর দিতে গেলেই যে কেন চিঁ চিঁ করে উঠি কে জানে । আমার পরিচিত মানুষজনেরা বলেন এ হেন আমি যে কিনা পাঁচ থেকে পঁয়ষট্টি সব বয়সের সব রকমের নারী পুরুষের সঙ্গে অনর্গল বেশ স্পষ্টভাবে কথা বলে যেতে পারি, চাপান উতোরের সময় সেই আমিই নাকি তোতলাতে থাকি । এক্ষেত্রে নিজেই তার যথাযথ প্রমাণ পেলাম । বেশ গুছিয়ে ভাবনা চিন্তা করে একধারে সরে গিয়ে ক্ষীণ গলায় ভদ্রলোককে জানালাম, ‘আজ্ঞে ঠিক ঠাণ্ডা থেকে বাঁচার জন্য নয় । ট্রেনে ওঠার তাড়া জানালার ধারটি হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার ভয়ে ।’ ততক্ষণে মন্তব্যকারী ভদ্রলোকটি ঢুকে পড়েছেন ট্রেনের কামরার ভিতরে । তাঁর পিছন পিছন আরো প্রায় জনাদশেক । আমি গুটি গুটি পায়ে অবশেষে যখন উঠলাম ট্রেনে মনে গভীর উদ্বেগ ঘনিয়ে এল । আর সেই উদ্বেগে একটু আগে আমার দিকে ছুঁড়ে দেওয়া মন্তব্য বা তার লাগসই জবাব সব গেলাম ভুলে ।

ট্রেনের কামরাটি লম্বায় প্রায় ত্রিশ ফুট । তার দু ধারে সারি সারি বসার সীট । কামরার মাঝ বরাবর হাঁটার জন্য খালি জায়গা । প্রত্যেকটা সীটে দুজন করে বসতে পারেন । একজন জানালার ঠিক পাশে আর অন্যজন তার পাশে । সুতরাং জানালার ঠিক পাশটিতে বসতে না পারলেও জানালা দিয়ে বাইরেটা দেখার কোন অসুবিধেই নেই । ট্রেনের কামরাটিতে আগাগোড়া চোখ চালিয়েও সে দিন একটিও জানালা ধার খালি দেখতে পেলাম না । মনে মনে প্রমাদ গুণলাম । মনে হতে লাগল আজ আমার দিনটা ‘ষোল আনাই মাটি ।’ ধর্মে কর্মে এমনিতে আমার মতি নেই বিশেষ । কিন্তু আপৎকালে বিপত্তারণ মধুসূদনের নাম স্মরণে আমি তৎপর । রাধামাধবের শরণাপন্ন না হলে যে সে দিন জানালার ধারের সীটটি আমার কপালে জুটবে না এ ব্যাপারে আমি তখন নিঃসন্দিগ্ধ । তাঁর একশ আটটি নামের মধ্যে যে কয়টি সে মুহূর্ত্তে মনে পড়ছে আওড়ে চলেছি আর এদিক ওদিক তাকাচ্ছি । ‘হরি হে ! তুমই সত্য !’ সীট একখানা পেয়েও গেলাম জানালার ধারে । একজন নিত্যযাত্রী হঠাৎ করে সরে এলেন জানালার পাশের জায়গাটি থেকে । আমিও সেই তালে চট করে ঢুকে পড়লাম সেখানে ।

বেশ গুছিয়ে বসে গলার স্কার্ফটি খুলে কোলের উপর রেখে পিঠের ভারী ব্যাগটা যেই না নামাতে যাব ওমনি আর এক দফা বিপত্তি । আমার পাশের যাত্রীটিকে মনে মনে এতক্ষণ ধন্যবাদ দিচ্ছিলাম জানালা ধারটি ছেড়ে বসার জন্য । তিনি কিন্তু এবারে হাঁ হাঁ করে উঠলেন, ‘ঠিকমতো সামলাতে না পারলে এত ভারী ব্যাগ নিয়ে যাতায়াত করা কেন বাপু ?’ ভারী শীতপোষাকের আড়ালে মানুষজনের চেহারা ভাল বোঝা যায় না । গলার স্বরে মালুম হল ইনি সেই দরজারক্ষী যিনি একটু আগেই আমার আচরণে ভারী অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন । আমার সাধ্য অল্প কিন্তু সাধ অনেক । ট্রেনে যাতায়াতের পথে পড়ব বলে রোজই পিঠব্যাগে বোঝাই করে নিয়ে যাই গাদা গাদা বই । প্রায়শই সে সব বই-এর অনেক পাতা না উল্টান থেকে যায় । তাও তারা থাকে সঙ্গে । প্রিয়স্পর্শের মতো পিঠে তাদের বোঝাটুকু না থাকলেই কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা লাগে । এ ক্ষেত্রে ভুল আমারই । তাই ক্ষমা চাইলাম পার্শ্ববর্ত্তীর কাছে । সব সামলে বসে জানালার কাঁচে চোখ লাগাতেই কানে এল, ‘মেট্রা ট্রেনে বুঝি এই প্রথম চড়া হচ্ছে ?’

‘আজ্ঞে না ।’

‘বুঝেছি । মাঝেমধ্যে চড়া হয় । তাইজন্যই জানালার ধারটির জন্য এত আগ্রহ ।’ বেশ বুঝদার ভঙ্গীতে বললেন ভদ্রলোক । তাঁর কথার প্রতিবাদ জানাতে বেশ একটু মায়াই হচ্ছিল । আহা ! তাঁর এমন সুনিশ্চিৎ ধারণাটিতে আঘাত হানব ? তাও মিনমিন করে বলেই ফেললাম, ‘তা প্রায় বছর আষ্টেক হতে চলল – সকাল সন্ধ্যে এই পথেই যাতায়াত ।’

এবারে সহযাত্রীর চোখ কপালে ওঠে । হয়ত আমার মাথার সুস্থতা সম্বন্ধেও সন্দেহ দেখা দেয় । ‘এই তো কালিঝুলি আকাশ আর তার গায়ে ঠেসান সরু সরু ন্যাড়া ডালপালা । এর মধ্যে দেখার আছেটা কি যে জানালার ধার নিয়ে এ হেন মাথাব্যাথা ? বছরের অন্য সময় হলেও বা বোঝা যেত ।’

এবার আমার চুপ থাকার পালা । সত্যিই তো । দেখার মতো কিই বা এমন আহামরি দৃশ্য বাইরে ? ঘোলাটে আকাশ । চারপাশে মসৃণ চাদরের মতো জড়ান অন্ধকার । ক্রমশঃ অন্ধকার সরে গিয়ে ফুটে ওঠে মরা আলো । একটু একটু করে স্পষ্ট হতে থাকে ন্যাড়া গাছের মাথা, ঘরবাড়ীর চাল । একসময় ভোরের আলো নেমে আসে মাটির কাছাকাছি । তখন ‘কাল রাতি’ যায় ‘ঘুচে ।’ চারদিক আলোকিত । হলই বা মরা, আলো তো ? রাতের শেষে একটা নতুন দিনের শুরু । আর আমি সেই সন্ধিক্ষণের সাক্ষী । এ কি কম সৌভাগ্য আমার ? এই সৌভাগ্যের আকাশে কাল মেঘের সম্ভাবনা মাত্রেই তাই মন উতলা । আকাশ, আলো, মাটির এ রোজকার খেলা । খেলার নিয়ম বদলায় না । বদল হয় খেলুড়েদের কেরামতি আর দর্শকদের মনের চোখ ।

‘কাল ছিল ডাল খালি / আজ ফুলে যায় ভরে ।’ আর কিছুদিন পরেই আজকের ন্যাড়া গাছগুলোয় ঝেঁপে আসবে পাতা । চারদিক তখন সবুজে সবুজ । একটুখানি হাত বাড়ালেই যেন পাওয়া যাবে অনেকটা সবুজ । মাটির আঁচলে ছড়িয়ে পড়বে ‘রোদের সোনা ।’ ঝোপঝাড়ের আড়ালে যে নালাটার অস্তিত্ব এখন আছে কি নেই তা নিয়েই সন্দেহ জাগে বৃষ্টির জলে ভরে কলকলিয়ে বয়ে চলবে সেও । তার কালচে সবুজ জল ফুঁসে উঠবে । সেই নালার সঙ্গে দেখা আমার মাত্র মিনিটখানেকের জন্য । তাও ভারী বেশী করে চোখে পড়ে তার এই রূপবদল । তারপর শুরু হবে গাছের পাতায় রঙ লাগার পালা । লাল, কমলা, বেগুনী, হলুদ – ঝরে যাওয়ার আগে বিচিত্র প্রাণের খেলা এ এক । আকাশের নীল তখন অমলিন । তার বুকে মাঝে মাঝে ভেসে চলবে সাদা মেঘের পালতোলা নৌকো । তারপর আবার সেই ন্যাড়া গাছ আর কালিঝুলি আকাশ । প্রকৃতির এই বছরোয়ারি খেলাও অজানা অদেখা নয় । তাহলে ? জানালার ধারে বসার কিসের এত নেশা হে তোমার ?

তা বললে হবে কেন ? এই যে অন্ধকার সরে গিয়ে আলো ফোটা – সে আলো এক এক দিন এক এক ভাবে রাঙায় যে সব । গাছের সঙ্গে, জলের সঙ্গে, মাটির সঙ্গে আকাশের আলোর এ খেলা আবহমান কিন্তু নিত্যনতুন । পরপর কোন দুটো দিন তো আর এক রকম নয় । তাছাড়া জানালা দিয়ে শুধু কি বাইরে দেখা ? এ হল বাহির পানে চোখ মেলে নিজের গভীরে ডুব দেওয়া । এইটুকুই তো সময় তার জন্য । কিছুক্ষণের মধ্যেই জীবনের তরঙ্গ এসে ঝাঁপিয়ে পড়বে চারধারে । ব্যস্ত বাস্তবতার ছোঁয়া লাগবে সবখানে । এইটুকু সময় শুধু নিজের মধ্যে নিজে থাকা – ‘ওই গাছেদের মতো ঘাসে, পাতায়, ফুলে, ফলে, ছায়াতে, মাটিতে, রোদ্দুরে যুক্ত হয়ে থাকা’ । জানালার ধারে বসার লোভ ছাড়ি কি করে ? মৃদু হেসে তাই সহযাত্রীকে উত্তর দিলাম, ‘ওই একটা অভ্যেস আর কি ! আপনার অনেক অসুবিধে হল আজ আমার জন্য । দুঃখিত ।’ পার্শ্ববর্তী এবার নিরুত্তর । ট্রেন চলেছে আপন গতিতে । সরে সরে যাচ্ছে টুকরো মেঘ, গাছেদের সারি, বাড়ী ঘর, স্টেশনে স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষ । আবছা হতে হতে মিলিয়ে যাচ্ছে অনন্ত সময়ে ।

ক্রমশ ফুরিয়ে আসছে পথ । এক সময়ে ট্রেন পৌঁছে যাবে তার নির্দিষ্ট গন্তব্যে । শেষ স্টেশনে ট্রেন থামার একটু আগে উঠে দাঁড়ালাম । এবারে নামার পালা । সীট ছেড়ে আইলে দাঁড়াতে যাচ্ছি যাতে ট্রেন থামলেই নেমে পড়তে পারি । আমার পাশে বসা ভদ্রলোকটি আবারও বিরক্ত হলেন । নিবিষ্ট মনে কিছু একটা করছিলেন । আমি উঠে দাঁড়াতে সেটায় বাধা পড়ল । কিন্তু তিনি সরে না বসলে আমার বের হওয়ার উপায় নেই । আবারও ক্ষমা চাইতে তাঁর দিকে তাকাতেই ভাল করে চোখে পড়ল, কোলে ল্যাপটপ, কানে হেডফোন । বিরক্ত তাঁর হওয়ারই কথা । ইলেকট্রনিক্স-এর জগৎ থেকে মিনিট খানেক আগে তাঁকে সরে যেতে হল আমার জন্য । বুঝলাম এইজন্যই হয়ত ট্রেনের জানালার বাইরে চলন্ত ছবির তেমন আকর্ষণ নেই তাঁর কাছে । জানালা তাঁরও আছে । তবে সে হল screen operation window. আর সেই window ছিটকিনি তুলে দিয়েছে অন্য সব জানালায় যেখান দিয়ে চলকে পড়ে আকাশের নীল, ভোরের আলো, গাছপালার সরসতা । নিজের মনে হেসে তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে এগিয়ে পড়লাম আর একটি কর্মব্যস্ত দিনের মোকাবিলায় ।

বন্দী

ধীমান চক্রবর্তী

তোমার কাছে বন্দী হওয়ার
ছোট্ট ছিল গন্ডী,
সেইটুকুতেই ফেলল এনে
ভাগ্য ক'রে ফন্দি ।

যে যার ঘরে নিদ্রামগ্ন,
দুয়ারে খিল তোলা ;
শুধু তোমার ঘরের দরজা জানলা
হাট ক'রে সব খোলা ।

যুদ্ধক্লান্ত সৈনিক একা
কাঁদছিল চোখ বুজে —
আর কোনদিন ভরবে না সে
বন্দুক কার্তুজে ।

দাওয়ায় ব'সে একলা তুমি
কোলে রাশি জুঁই,
দেখে আগন্তুককে, হাসলে শুধু,
বললে না কিছুই ।

কিছু দূরে সীমান্ত, আর
তার পরে এক গ্রাম ;
সেথায় হয় তো মিলতে পারে
কাঙ্ক্ষিত বিশ্রাম ।

ভোরের আকাশ যত দূরে,
পুকুর ততই কাছে ;
তোমার চোখে তবুও তারা
একই সঙ্গে আছে ।

যুদ্ধবিমুখ সৈনিক, যে
কাঁদছিল মুখ বুজে,
পৌঁছল সেই গ্রামে একা
রাত্তিরে পথ খুঁজে ।

লোকটি দেখে দাওয়ার সামনে
ছোট্ট একটু গন্ডী ।
তাইতে ঢুকে বলল হেসে,
''আমি তোমার বন্দী ।''

কবিতা

যদি

শৈবাল তালুকদার

সন্ধ্যে পায়ে পায়ে জড়িয়ে গায়ে গায়ে
নিপুন রাতের সাথে মিথুন মুদ্রায়
কোমল গান্ধার মেশে শুদ্ধ ধৈবতে
একাকী চাঁদ ভেজে ভরা জ্যোৎস্নায়

মায়াবী মেঘ হাসে রাতের গালে টোল
দারুণ স্বপ্ন জুড়ে
তারার কথকতা
প্রণয় মেতে ওঠে হৃদি বিভোল

এমনি বারোমাস কবিতা জুড়ে থাক
এমনি চারদিকে জ্যোৎস্নায় ভেসে যাক
প্রাণের পদাবলী প্রণয়ে মেলে যদি
সকল কোলাহল থেমে যাক

রাত্রিলিপি

ধীমান চক্রবর্তী

হাওয়া বইছিল পশ্চিম থেকে পূবে
চাঁদ গিয়েছিল মেঘের পিছনে ডুবে
আকাশ আছিল কালো
কুটির-সমুখে সমুদ্র বিস্তৃত
দু'পা এগোলেই সেও বুকে টেনে নিত
বিদ্যুৎ চম্‌কালো
চকিত ঝলকে অদূরের বালিয়াড়ি
মুখ দেখিয়েই লুকিয়েছে তাড়াতাড়ি
দুলেছে গাছের মাথা
কড়িকাঠে ঝোলা ছোট্ট বিজলিবাতি
বন্ধু আমার হয়েছিল রাতারাতি
টেবিলে লেখার খাতা
তুঁতেরঙ শাড়ি পরিহিতা এক নারী
স্মৃতির বাগানে আনমনা পায়চারি
করছিল একা একা
বেড়াতে যাবার ত্বরিত প্রস্তুতিতে
ভুলেছিনু তার ছবিটি সঙ্গে নিতে
তবু কবিতায় দেখা ।

গল্প

উইদাউট আ প্রিফেস

ইন্দ্রানী দত্ত

আঙুলের ছোঁয়া লাগছিল মুখে, কখনও চোখ কখনও নাকের পাশে। আলগোছে। হাল্কা ছোঁয়া। অথচ শিরশির করছিল শরীর। সমস্ত শরীর। আঙুলের নখ ছুঁয়ে যাচ্ছিল কানের পাশের গাল। আলতো। চন্দনের ঘ্রাণ আসছিল। চোখ বুজে আসছিল কপালে ঈষৎ সূচালো কিছুর স্পর্শে। সে স্পর্শ যেন অবিচ্ছিন্ন তরঙ্গের মত কপালকে ছুঁয়ে যাচ্ছিল নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে। ও চোখ খুলতে চাইল। চোখের পাতা ভারি ঠেকল। সামনে দেখল হালকা কচি কলাপাতা রং, লাল পাড়ে ঘেরা। দৃষ্টি ঈষৎ নামিয়ে নিজেকে দেখতে চাইল এবারে। লাল বেনারসীতে দেখল নিজেকে। গভীর বিস্ময়ে। দেখল কনেচন্দন পরানো হচ্ছে তাকে। কচি কলাপাতাকে ধাক্কা দিয়ে সরাতে গেল সে। হাওয়ায় তালাস করে ফিরল তার হাত। ভারি হয়ে এল তারপর। হাত। সর্বশরীর। কোন এক বিপুল উচ্চতা থেকে পতন হতে থাকল। সে পড়ছে তো পড়ছেই। আতঙ্কে দমবন্ধ হয়ে এল যেন। মুহূর্তকাল।

ধরমড়িয়ে উঠে দেখল পাশে ঘুমন্ত সুদীপ। দেখল হাল্কা রাত আলো। দেখল তার খাট বিছানা। তার ঘরদোর। বিনবিনে ঘাম হচ্ছিল তার। কম্বল সরিয়ে বাথরুম গেল। জল খেল। জানলার ব্লাইন্ড সরিয়ে দেখল সাইডওয়াকে জমা বরফ। নিষ্পত্র গাছ। স্ট্রীটলাইট। গত বিশ বছরের চেনা দৃশ্য। ও বিছানায় ফিরে গেল। কম্বলের তলায়। ঈষৎ পা ঘষল। ঘুমন্ত সুদীপের পিঠে হাত রাখল আলগোছে। তারপর ভাবতে চাইল কে চন্দন পরাচ্ছিল তাকে। কচি কলাপাতা শাড়ি। লাল পাড়। ভাবতে চাইছিল। সমস্ত স্বপ্নটাকেই ফিরিয়ে আনতে চাইছিল মনে মনে। সুদীপ জড়ানো গলায় কিছু বলল। কাশল ও ঘুমে ডুবে গেল আবার।

ওর ঘুম ভাঙল ঘড়ির অ্যালার্মে। ভোর পাঁচটায়। সুদীপ তখনও ঘুমোচ্ছে। চোখ খুলেই মনে হল ওর নতুন চাকরি, আজ প্রথম দিন। কম্বল সরালো, বালিশ থেকে মাথা তুলল ও। সুদীপ ওর হাত ধরল তখনই।

– এখনও রেগে আছ?

– দেরি হয়ে যাচ্ছে। ছাড়ো উঠতে দাও।

– দপদপাইয়া হাঁটে নারী / চোখ পাকাইয়া চায় – ঘুম থেকে উঠছ না পেনাল্টি কিক মারছ? শোনো, না চাইলে যেও না। ফোন করে দিও। পরে ফরমাল একটা চিঠি দিয়ে দিও – চাকরিতে জয়েন করছ না তুমি ডিউ টু – যা ইচ্ছে লিখে দিও।

– ইন্টারভিউ দিয়েছি। অফার অ্যাকসেপ্ট করেছি। তুমিই জোর করলে চাকরীর জন্য। এখন এসব কথার মানে হয় না। ছাড়ো। সুদীপ আবার কাশে। হাত ছাড়ে। পাশ ফিরে শোয়। সিংহের কেশরের মত চুল ওর। অনেকটাই রুপোলী। চওড়া কাঁধ। পিঠ। স্বাতী হাত রাখে সুদীপের চুলে। বিছানা ছেড়ে ওঠে। ও বেশ লম্বা। বাঙালী মেয়ের গড় উচ্চতা ছাড়িয়ে পাঁচ পাঁচ হবে। আজকাল রোজ সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর ওর মনে হয় ও যেন আর তত লম্বা নয় – বেঁটে হয়ে যাচ্ছে যেন। সুদীপ হাসে। বলে – আত্মবিশ্বাসের অভাব, স্বাতী। স্রেফ ল্যাক অফ কনফিডেন্স।

স্বাতী পায়ের আঙুলে ভর দেয়, গোড়ালি উঁচু করে। একবার দুবার তিনবার। দু হাত তোলে শূন্যে। সামান্য হাঁফায়। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে সুদীপ হাসছে। রাগ নাকি অভিমান ফণা তোলে। দুপ দুপ করে হেঁটে বাথরুমে ঢোকে ও। আর এক ঘন্টা পরে স্বাতী যখন রেল স্টেশনে ওর গাড়ি পার্ক করবে, টিকিট কাউন্টারে গিয়ে মান্থলি রেল পাস চাইবে, সিঁড়ি বেয়ে প্ল্যাটফর্মে পৌঁছে ট্রেনের অপেক্ষা করবে তখন ওর আর মনে পড়ছে না স্বপ্নের কথা। নতুন চাকরি। একটা সুপারমার্কেটের মার্চেন্ডাইস সেকশনের সেলসের কাজ। স্বাতীর একটু ভয় হয় – পারবে তো ও? কোনদিন চাকরি করেনি এ দেশে আসা পর্যন্ত। গত ছয় মাস সুদীপ জেদ করেছে প্রবল। এরকম জেদ করতে স্বাতী দেখেনি আগে। ছেলেমেয়েদের পড়াশোনা শেষ, অন্য শহরে নিজের মত থাকে তারা। এখন

তুমি কি করবে স্বাতী ? এভাবে বাড়িতে বসে থেকে কি করবে তুমি ? কোনদিন চাকরি কর নি । ছোট থেকে শুরু করো, একটু কনফিডেন্স আসুক তারপর তোমার যোগ্যতা, তোমার পছন্দ মত কাজ খুঁজে নিও ।

স্বাতী তর্ক করেছে । ঝগড়া । রাগ । অবশেষে মেনে তো নিল । কেন যে মেনে নিল নিজেও জানে না । গত ছ-মাসের পুরোনো কথা মনে আসছিল ট্রেনে বসে, ভুরু কুঁচকে যাচ্ছিল নিজের অজান্তেই । কপালে ভাঁজ পড়ছিল । ঠিক তখনই মনে পড়ে গেল কপালে আলতো আঙুলের ছোঁয়া, চন্দনের ঘ্রাণ – রাতের স্বপ্ন । সময় হিসেব করে দেখল কস্তুরীর এখন বিকেল হয়ে এসেছে । অফিসে ব্যস্ত হয়তো । তবু কথা বলতে তীব্র ইচ্ছে হল স্বাতীর । সেই মুহূর্তেই ট্রেনটা টানেলে ঢুকল । নো সিগনাল । লম্বা টানেল পেরিয়ে স্টেশনে ঢুকছে ট্রেন । এবারে নামতে হবে স্বাতীকে । টানেল আসবার সময়টা আন্দাজ করে নিল ঘড়ি মিলিয়ে । স্টেশন থেকে বেরিয়ে মিনিট পাঁচেকের হাঁটা পথ । বিশাল ডিপার্টমেন্টাল স্টোর – কাঁচ দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকতেই শিরশিরে একটা কাঁপুনি এল শরীরে । একটা এস এম এস করল কস্তুরীকে – শুরু করলাম । সুদীপকে ফোন করে বললো – পৌঁছে গেছি ।

সেদিন কস্তুরী যখন ওর অফিস থেকে বেরোলো, তখন সন্ধ্যা নেমেছে । বাহাদুর গাড়ি নিয়ে অপেক্ষায় ছিল । বেশ অনেকক্ষণ এসেছে । নীল মারুতি ভ্যানের ওপর খানিক আগের আঁধির ধুলো । হাল্কা পরত । ঝড়ের শুকনো পাতা বৃষ্টির হাল্কা ছাঁটে আটকে আছে । বাহাদুর লাল ঝাড়ন দিয়ে মুছছে গাড়ি ।

গাড়িতে উঠে বসল কস্তুরী । ব্যাগ নামালো কাঁধ থেকে । বাঁহাঁটুটা সামান্য খচ করে উঠল । রোজ যেমন হয় গাড়িতে ওঠার সময়টায় । ড্রাইভারের আয়নায় নিজেকে দেখল ও । গোল মুখ কপালে বয়সের ভাঁজ । দু এক গুচ্ছ পাকা চুল । ও আলতো আঙুল চালালো চুলে । বাহান্ন হ'ল ।

মোবাইলটা বাজল তখনই । ব্যাগ থেকে ফোন বের করতে গিয়ে হাত ফস্কে গাড়ির মেঝেয় । মোবাইলে এখনও অনভ্যস্ত কস্তুরী । রিং হচ্ছিল তখনও । তার মানে স্বাতী । আর কেউ না ।

কি রে ব্যস্ত ? এতক্ষণ লাগল ফোন ধরতে ?

– আমার কান্ড ! ধরতে যাবো । হাত ফস্কে মাটিতে । না না ভাঙেনি । এই তো ফিরছি অফিস থেকে । এই তো পাঁচ মিনিট । হ্যাঁ আজ একটু আগে । বাজার করার আছে । মাছ টাছ । তোর কাজ কেমন চলছে আগে বলবি তো ।

– ভালো । ভীষণ ভালো লাগছে ।

স্বাতী এইখানে বেশ উত্তেজিত হয়ে জোরে জোরে ওর ভাল লাগার কথা বলতে থাকে । আটলান্টিক পেরিয়ে সেই ভালো লাগা, ওর উত্তেজনা পৌঁছে যেতে থাকে কস্তুরীর কানে । খুশী হবে কি না ভাবতে হয় কস্তুরীর । মার্চেন্ডাইস গুছিয়ে রাখা, কাস্টমারকে সাহায্য করা – এই কাজে আনন্দ পাচ্ছে স্বাতী ।

– স্বাতী তুই এতদিন কোন চাকরী করলি না, বলতিস কোনদিন করবি না, এখন এই চাকরিই এত ভালো লাগছে তোর ?

– সুদীপ খুব জোর করছিল । বলেছি না ? কিন্তু এখন মনে হচ্ছে জোর করেই ঠিক করেছে । ভীষণ ভালো লাগছে আমার । অবিশ্রান্ত কথা বলে চলে স্বাতী । ওর কোলিগ, ওর বস, এক খ্যাপা ক্রেতা, বোনাস, ওর রোজকার রুটিন । স্বাতীর প্রবল উচ্ছাসে সামিল হতে না পারার জন্য মনে মনে কুঁকড়ে যেতে থাকে কস্তুরী । ব্যাগের গায়ের আঙুল রাখে, তোলে, নামায় । অন্য হাতে কুঁচি ঠিক করে শাড়ির । লাইন কেটে যায় আচমকাই । আটলান্টিকের ওপারে স্বাতীর ট্রেন টানেলে ঢুকছে । কস্তুরী যখন ওদের অ্যাপার্টমেন্টে ঢুকল, গাড়ি পার্ক করছে বাহাদুর, পূর্ণেন্দু ড্রয়িংরুমে টিভি দেখছে । কস্তুরী ড্রয়িং রুম পেরিয়ে শোবার ঘরে এল । তারপর কিচেনে ঢুকে ঠান্ডা খাবার বের করে রাখল । মাইক্রো ওয়েভে গরম করবে । বাহাদুর বাজারের ব্যাগ আর গাড়ির চাবি দিয়ে গিয়েছিল । ঘরে আলো জ্বালা ছিল । মাইক্রো ওয়েভে ঘূর্ণায়মান নৈশাহারের সুগন্ধ ভাসছিল । টিভির ভল্যুম লো অথবা মিউট করা ছিল । নৈঃশব্দের কি নিজস্ব গন্ধ কিম্বা আয়তন ? এই মাইক্রো ওয়েভের গোঁ গোঁ আওয়াজ, মুরগীর মাংসের গন্ধ এই সব উপাদানে গঠিত হচ্ছিল নৈঃশব্দের অবয়ব, এই সতেরোশো স্কোয়ার ফিটে । যেমন হয়ে থাকে । যেমন হয়ে এসেছে পঁচিশ বছর ।

অন্য কোথাও, পৃথিবীর অন্য কোনও প্রান্তে তখন ভোর হচ্ছিল । স্বাতীর উচ্ছাস তখনও ফুরোচ্ছিল না । সুদীপকে

অজস্র চুমু খাচ্ছিল ও। সুদীপের কপাল চন্দনের ফোঁটার মত ভরে যাচ্ছিল চুমুতে। ঠোঁট ভিজে যাচ্ছিল অবিশ্রান্ত। নরনারী মিলিত হবে এখন। স্বাতীর ধুসর চুলে আসুল বোলাচ্ছিল সুদীপ।

– বেড়াতে যাবে ? অনেকদিন কোথাও যাইনি আমরা . . .

. . . সুদীপের ছোটবেলার শহর প্রথমে – উঁচু নিচু পথ, উপত্যকা, ছোটো টিলার ওপর কলেজ, জঙ্গল, ভাঙা রাজবাড়ি, না কাটা দাড়ি আর ডায়বেটিসে কিছু চেনা মানুষ, এখনও – পুরোনো ওষুধের দোকান, ধানক্ষেতের পাশে শ্মশান। তারপর বালি, কেল্লা, উট – ওদের মধুচন্দ্রিমার শহর। সেই সব গলি, এক পাশে বিশাল কড়াইতে দুধ উথলাচ্ছে – কেশর বাদামবাটা দুধ এ'গেলাস থেকে সে গেলাস আলম্ব নামছে – এ পাত্র থেকে সে পাত্র, সে পাত্র থেকে এ পাত্র, অন্য পাশে কড়াইতে তেল, বেসন, সুবৃহৎ লঙ্কাভাজা, বালির বুক চিরে মসৃণ কালো পিচ রাস্তা, স্যান্ডিউন, উটেদের সারি। প্রাচীন জলাশয়ের ধারে – আজও আকাশ ভরে পাখি উড়ছিল ইতস্ততঃ – আসন্ন সূর্যাস্তের কমলা আলোয় প্রাচীন ছত্রীর কালচে শিল্যুএট – তার পাশে আবৃতমুখ বৃদ্ধ – সাদা কাপড়ের শিরস্ত্রাণ। বাঁ হাতে যন্ত্র। ডান হাতে ছড়। ছড় চলেছে মসৃণ, সমান্তরাল .... কেশরুয়া বালমা। পাখি উড়ছে। উড়ে বসছে। সারিন্দায় বেজে চলছে কেশরুয়া বালমা ....

তখন মধ্যরাত। কস্তুরীর সেলফোনে স্বাতীর মেসেজ আসে – ও চলে গেল এই মাত্র। ম্যাসিভ অ্যাটাক। কিচ্ছু করতে পারলাম না।

রেজিগনেশন দিয়েছিল স্বাতী। ভালো লাগছিল না আর। সময় কেটে যাচ্ছিল – এটা ঠিক। কাজু আর মিঠি বারণ করেছিল – ছেড়ো না বলেছিল। বলেছিল – বাবা খুশি হোতো না। আর সমস্তদিন একা একা কি করবে ? স্বাতীও জানে না কি করবে ও। একটা অ্যাড দেখছিল। কমিউনিটি কলেজে টাউন প্ল্যানিং পড়ানোর লোক খুঁজছে। অ্যাপ্লাই করবে ভাবছিল। বাড়িটা বিক্রি করে কাছেই একটা অ্যাপার্টমেন্ট কিনেছে স্বাতী। সেখানেই আছে।

কিছুদিন যাবৎ একটা খেলা খেলত ওরা। সুদীপ আর ও। ওকে ভেবে নিতে হত সুদীপ নেই, সুদীপ ভাবত স্বাতী নেই। মৃতদেহ কল্পনা করে নিতে হত দুজনের। খেলতে খেলতে কেঁদেছে স্বাতী। পাগলের মত কেঁদেছে। প্রস্তুত ভেবেছিল নিজেকে। অথচ খেলাটা এতটুকুও হেল্প করছে না এখন।

স্বাতী ভাবতে চেষ্টা করছিল অন্য ঘরে আছে সুদীপ। পাশের ঘরে। এ ঘরে আসছে না তাই দেখা হচ্ছে না। ভাবছিল হয়ত। কিম্বা সম্পূর্ণ শূণ্য ছিল ওর মন।

জানলার কাঁচে ঘনীভূত জল হয়ে গড়িয়ে নামছিল। বাতাসে জলকণা ছিল পর্যাপ্ত। রান্নার উষ্ণ বাষ্প মিশেছিল তাতে। ছোট তোয়ালে দিয়ে জানলার কাঁচ মুছছিল স্বাতী। জলকণাগুলি একত্র হয়ে নেমে আসছিল, তোয়ালে শুষে নিচ্ছিল তা। জানলার বাইরে বড় গাছ, উল্টোদিকের বড় বাড়ি – স্বাতীর চোখে পড়ছিল আবার পড়ছিলও না। ওর হাত চলছিল যান্ত্রিক। মন কখনও সুদীপ, কখনও কস্তুরী কখনও উল্টোদিকের ব্যালকনির বাহারি গাছে ছিল। হাত নেমে আসছিল, চক্রাকারে ঘুরছিল। কাঁচ শুকিয়ে আসছিল দ্রুত। ভেজা তোয়ালে নিয়ে কিচেনে ঢুকল স্বাতী। ঈষৎ অন্যমনস্ক। স্রেফ ভাত আর ডাল রান্না করেছিল ও। ভাতের মাড় ভাতেই মরে গিয়েছিল। ডাল ফুটে উপচে পড়েছিল স্টোভটপে। এখন শুকিয়ে গেছে। ভেজা তোয়ালে দিয়ে আলতো ঘষল ও। তারপর ক্লিনিং সল্যুশন স্প্রে করল স্টোভটপে। কিছু আগে হটপ্লেট অন ছিল। তখনও গরম। রাসায়নিকের সামান্য কয়েক ফোঁটা অদ্ভুত এক বাসের জন্ম দিল। না ফেলা ট্র্যাশব্যাগের ঈষৎ টক গন্ধ, সারারাতের আটকে থাকা বাসি বাতাসের গন্ধ, সব ছাপিয়ে উঠল আশ্চর্য এক গন্ধ। কিসের গন্ধ জানে না স্বাতী। ওর বুক উথাল পাতাল হল আচমকা। দৌড়ে অন্যঘরে এল। এক টানে খুলল সুদীপের ওয়ার্ডরোব। সুদীপের শার্ট, টি শার্ট, ট্রাউজার্স, ব্লেজার। হ্যাঙ্গার থেকে খুলে নিল শার্ট। বের করে আনল আয়রনিং বোর্ড, আয়রন। ইস্ত্রি করতে লাগল সুদীপের শার্ট, নীল সাদা চৌখুপি, সবুজ পিন স্ট্রাইপ, বাটার ইয়েলো – উত্তাপে বেরিয়ে এলো ব্যবহৃত পারফিউমের অবশিষ্ট বাস। ঘোরে পাওয়া মানুষের মত ইস্ত্রি করে চলছিল স্বাতী। জোরে জোরে ঘষছিল সুদীপের বুক পকেট কলার, কাঁধ। ওর হাত ব্যথা করছিল। বাস উঠে আসছিল। পুরোনো সব বাস। ওকে বেষ্টন করছিল।

আচমকা কলিং বেল বাজে এই সময়। স্বাতী চমকে উঠে দরজার কাছে যায়। কিহোলে চোখ রাখে। দরজা খোলে। পুলিশ অফিসারটি বয়সে তরুণ। কেতাদুরস্ত ভঙ্গিতে আই ডি কার্ডটি স্বাতীকে দেখিয়ে পকেটে রাখে।

– ইভ্যাকুয়েট করতে হবে ম্যাডাম । ইমিডিএটলি । যে অবস্থায় আছেন । আপনার ওপরের অ্যাপার্টমেন্টে একসপ্লোসিভ পাওয়া গেছে । বম্ব ডিসপোসাল আসছে । ওরা গ্রীন সিগনাল দিলে তবে ফেরত আসতে পারবেন । বাট এভ্যাকুয়েট, নাউ । ইমিডিয়েটলি । স্বাতী ইস্ত্রি আনপ্লাগ করে, গায়ে চাদর জড়িয়ে বেরিয়ে আসে ।

বাইরে ততক্ষণে বেশ লোক । পুলিশ অফিসারটি, দু-তিনজন চাইনিজ তরুনী – ইউনিভার্সিটির ছাত্রী – স্বাতী দেখেছে আগে – সিঁড়িতে, লবিতে । এছাড়া ছড়িয়ে ছিটিয়ে বয়স্ক মানুষ কজন । একজনের মাথায় বেসবল ক্যাপ, কানে মোবাইল, উত্তেজিত হয়ে কথা বলছেন । মুখ চেনা একজন, বাকি দুজনকে দেখেনি স্বাতী । অফিসারটি স্বাতীর কাছে এসে খাতা খোলে । ওর নাম, মোবাইল নম্বর লিখে নেয় । স্বাতী কিছুটা অগোছালো ঘুরতে থাকে কমপ্লেক্সে । বেসবল ক্যাপ এবারে মোবাইল পকেটে ঢুকিয়ে এগিয়ে আসেন ।

– আপনাদের খুব অসুবিধে করলাম । এক্সট্রেমলি সরি । আপনার ওপরের অ্যাপার্টমেন্টটা আমার মা-র । জানেন তো ?

– ঠিক জানি না । আমি খুব বেশিদিন আসিনি এই অ্যাপার্টমেন্টে । তবে দেখছি মাঝে মাঝে ব্যালকনির টবে জল দিচ্ছেন এক বৃদ্ধা । তিনি-ই তবে আপনার মা ।

– মা গত সপ্তাহে আমার কাছে এসে অসুস্থ হয়ে পড়েন । সেই থেকে নার্সিং হোমে । আমি আজ এসেছিলাম অ্যাপার্টমেন্ট ভ্যাকুয়াম করতে, গাছে জল দিতে । অগোছালো হয়ে আছে সব । পুরোনো একটা বাক্স ছিল । আমার বাবার । আজ এসে দেখি সেইটা সামনের ঘরে । খুললাম । পুরোনো ফোটো । পুরোনো চিঠির তাড়া আর তার তলায় চার চারটে গ্রেনেড । ভাবুন একবার । সঙ্গে সঙ্গে পুলিশে আর এমারজেন্সি কল করলাম । তারপর তো দেখতেই পাচ্ছেন । এক্সট্রিমলি সরি । থ্যান্ক গড যে বৃষ্টি ফৃষ্টি হচ্ছে না ।

– আপনার বাবা কি আর্মিতে ছিলেন ? হয়তো মেমেন্টো রেখে দিতে চেয়েছিলেন ।

– হ্যাঁ বাবা আর্মিতে ছিলেন । ওয়ার্ল্ড ওয়ারের ভেটেরান । মেমেন্টোই বটে । বাবা, মা কিচ্ছু ফেলতেন না । সব আছে, জানেন ? আমার ছোটো বোনের খেলনা, পুতুল এমনকি ঝুমঝুমিটাও । আমার বেসবল ব্যাট, সাইকেলের পাম্প । উফ । এখন কি ঝামেলা হ'ল বলুন তো । আপনাদের কাছে কি বলে ক্ষমা চাইবো . . .

– আমার খুব ইন্টারেস্টিং লাগছে কিন্তু ।

বলছেন ? পুলিশের ঝামেলাটা মিটে যাক, একটু ওপরে আসবেন । মা-র কফির শখ ছিল । ভালো কফি আছে । মরোক্কোর । কফি খেয়ে যাবেন প্লীজ ।

আমি পিটার ।

– আমি স্বাতী । এস ডাবলিউ এ টি আই ।

বম্ব ডিজপোজালের লোক আসে । ফায়ার ব্রিগেড । সাইরেন । পুলিশের গাড়ি । ভীড় বাড়ে । স্বাতী একলা দাঁড়িয়ে থাকে । কিছুক্ষণ আগের সেই সব গন্ধ ওকে ছেড়ে গেছে ততক্ষণে । বেবাক ফাঁকা মাথা । ফাঁকা মন । বাথরুমে যাওয়ার প্রয়োজন বোধ করতে থাকে ও । এভাবে বেলা বাড়ে । ভীড় হাল্কা হয় । হলুদ বেষ্টনী তুলে নেওয়া হয় । অফিসারটি গলা তুলে বলে ওঠেন – বিল্ডিং সম্পূর্ণ নিরাপদ । আপনারা ভেতরে ঢুকতে পারেন । একসপ্লোসিভগুলি সরিয়ে নেওয়া হয়েছে । স্বাতী গায়ের চাদরটা গুছিয়ে নেয় । অ্যাপার্টমেন্টে ফেরে । আয়রনিং বোর্ড, বোর্ডের ওপর সুদীপের শার্ট, ইস্ত্রিটা । স্বাতী বাথরুমে ঢোকে দ্রুত । আবার বেল বাজে । পিটার ।

– ফ্রী আছেন ? আসুন একটু, কফি খেয়ে যাবেন ।

ওপরের অ্যাপার্টমেন্টটির বিন্যাস স্বাতীর আস্তানার মতই । শুধু সর্বাঙ্গে প্রাচীন ছাপ । দেওয়ালে রং ওঠা ওয়াল পেপার, ছত্রাকের কালচে ছোপ, বিবর্ণ কার্পেট – রোঁয়া ওঠা । অদ্ভুত সোঁদা গন্ধ । পুরোনো বইয়ের । পুরোনো কাগজের । সোফার ওপর কার্ড বোর্ডের বাক্স । বাক্স ভরা গ্রামোফোনের প্রাচীন চাকতি । সেভেন্টি এইট, ফর্টি ফাইভ, থার্টি থ্রী আর পি এম । পুরোনো সব গান । ডাঁই করা বই । স্বাতী বই ঘাঁটে । কিচেনে কফি বানায় পিটার আর অবিশ্রান্ত বকে যায় । শিরদাঁড়াভাঙা জীর্ণ বই পোকায় কাটা, হলদে দাগ । স্বাতী ঘাঁটে, রেকর্ড ঘাঁটে । বইটি হাতে উঠে আসে এই সময় । হার্ডবাউন্ড বই ছিল, এখন মলাট থেকে খুলে এসেছে ।

– শোনো পিটার, এই যে বইটা – লেটার্স অফ অ্যান ইন্ডিয়ান জাজ টু অ্যান ইংলিশ জেনটল উওম্যান । পড়েছ ?

– নাঃ।

– পাবলিশারের নোটে কি লেখা আছে শুনবে ? লেখা আছে, These letters were not written with a view to publication. They are now printed with the author's permission, but for obvious reasons no name appears on the title page.

পিটার, বইটা নিতে পারি ?

– অফ কোর্স। ইন্টারেস্টিং লাগলো ?

– খুব।

– শুধুই পাবলিশারের নোট পড়লে তো !

– পিটার, দিস বুক ইজ পাবলিশড উইদাউট আ প্রিফেস।

– রিয়েলি ! কেন ?

– বলছে, since it seemed best to allow the letters to speak for themselves.

মেইল চেক করছিল কস্তুরী। রবিবার। পুর্ণেন্দু যথারীতি ড্রয়িং রুমে। টিভি চলছে। কিচেনে ঢুকে আভেনে প্যাটিস গরম করতে দিল কস্তুরী।

– অনুপম আসবে বলেছিল। এল না তো।

– আসবে। বলেছে যখন আসবে।

– শীতের বেলা, এক্ষুণি অন্ধকার হয়ে যাবে।

পূর্ণেন্দু টিভির ভলিউম বাড়িয়ে দিল এই সময়। পা তুলে দিল কফি টেবিলে।

অনুপম হন্তদন্ত হয়ে এল বেশ কিছু পরে। হই হই করে বলল,

– প্যাটিস পরে হবে। হেব্বি শীত। চলুন ব্যাডমিন্টন খেলে আসি একহাত। বৌদি, সোনাই রূপাই-এর র‍্যাকেটদুটো আছে ? পিন্টুদা, পাজামা ছাড়ো তো। প্যান্ট পরো। অন্ধকার হওয়ার আগে খেলে নিই চলো। ওদের হাউজিং কমপ্লেক্সের কোর্টে তখন শীতের বিকেল। আলো মরে আসছে দ্রুত। একপাশে শীর্ণ জবাগাছ। শুকনো ভঙ্গুর পাতা। কোমরে আঁচল গুঁজল কস্তুরী। ওদিকে অনুপম। শাটল কক উড়ছে। এদিক থেকে ওদিক। ওদিক থেকে এদিক।

হাল্কাচালে খেলা। কস্তুরী কোমরে হাত দিয়ে দম নিল সামান্য। অনুপমও।

– পিন্টুদা, দাঁড়িয়ে দেখলে হবে ?

– আর তো র‍্যাকেট নেই।

– আমার টা নাও। আমি একটু ইয়ে ফুঁকে আসি।

কস্তুরীকে আশ্চর্য করে পুর্ণেন্দু হাতে র‍্যাকেট নেয়। এক পা পিছনে নিয়ে ঈষৎ ঝুঁকে সার্ভ করে। এলোমেলো সার্ভ। শাটল মাটিতে পড়ে। কস্তুরী শাটল তোলে, আলতো আঙুল বোলায়। তর্জনীর নখের পাশের শুকনো চামড়ায় সাদা দাগ পড়ে। সার্ভ করে কস্তুরী। চাবুক চালানো স্ম্যাশ করে পূর্ণেন্দু। সপাটে ফেরত পাঠায় কস্তুরী। এক পা পিছিয়ে বাতাসে র‍্যাকেট চালায় পূর্ণেন্দু। কক উড়ে আসে তৎক্ষণাৎ। কস্তুরী তুলে দেয় আলতো। পূর্ণেন্দু আবার স্ম্যাশ করে। কস্তুরী ফেরত পাঠায়। পূর্ণেন্দু ওকে ছুটিয়ে বেড়ায়। নিজেও ছোটে। মাটিতে পড়ে না শাটল। পূর্ণেন্দু কোর্টে দাপিয়ে বেড়ায়। খ্যাপার মত দেখায় ওকে। শাটল কক শুকনো ঠান্ডা হাওয়া কেটে সাই সাই উড়তে থাকে। মাটি পায় না। কস্তুরীর বিনবিনে ঘাম শুরু হয়। বাঁ হাঁটু কমজোরি ঠেকে। অনুপম ফিরে আসে এই সময়।

– পিন্টুদা ঢিলে দাও, বৌদির টায়ার্ড লাগছে বোধ হয়।

পূর্ণেন্দুর র‍্যাকেট শাটল ছোঁয়ার শব্দ। তারপর বাতাস কাটার আওয়াজ ওঠে। সাদা পালক কটি একত্রিত – ভেসে আসতে থাকে কস্তুরীর দিকে। কস্তুরী চোখ সরায় না। ধূসর আকাশ, পাক খাওয়া কালচে মশার ঝাঁক পেরিয়ে আসতে থাকে শাটল কক, নিষ্পত্র বৃক্ষশাখের ব্যাকগ্রাউন্ডে শুভ্র পালকগুচ্ছ। সে মুহূর্তে পূর্ণেন্দুর মুখ দেখতে বড় সাধ হয় কস্তুরীর। সে চোখ সরায়। শাটল কক র‍্যাকেট না ছুঁয়ে মাটিতে পড়ে ফলতঃ। পূর্ণেন্দু র‍্যাকেট ছুঁড়ে দেয় শূণ্যে।

– ভাল্লাগছে না। ভেতরে চল্।

অনেক রাত্রে ঘুম ভেঙে কস্তুরী দেখে – বাইরের ঘরে টিভি চলছে তখনও – অন্ধকার ঘরে টিভির নীল আলো শুধু – টিভি চলছে – আলো কখনও কম কখনও বেশি – পূর্ণেন্দু পাজামা নামিয়ে দু-উরুর মাঝে হাত ঢুকিয়ে গোঙাচ্ছে। কস্তুরী লুকিয়ে ফিরে আসে। বালিশে মুখ ঢুকিয়ে হা হা কাঁদে। মৃত্যু

কামনা করে। পূর্ণেন্দুর। অথবা নিজের। ঠিক সেই সময়ে আটলান্টিকের ওপারে প্রাচীন বইটি খুলছে স্বাতী। বাতাস বইছিল না। নিষ্পত্র বৃক্ষরাজি, জনবিহীন সাইডওয়াক, একলা স্ট্রীটলাইট যেন কিছুর প্রতীক্ষায় ছিল। আকাশ ঘোলাটে। স্বাতীর দুহাতের মধ্যে প্রাচীন বই। শিরদাঁড়া ভাঙা। মলিন পাতা, ছত্রাকজন্মের কালচে ছোপ। একগুচ্ছ চিঠি। কবে খুব ভিজেছিল যেন। বিবর্ণমলাটদ্বয় যেন এতদিন তার জন্যেই আগলে রেখেছিল এই সব চিঠি। যেন ওর পাতা ওল্টানো শেষ হলেই ছিঁড়ে খুঁড়ে যাবে সব।

'You must excuse a letter from somebody you may this morning not even remember. It is the lonely young man with the black face beside the door - to whom you were so kind last night.'

নিচে সই – অরবিন্দ নেহেরা। চিঠি এক। একলা মানুষের নির্জন কখন শুরু হয়ে যায়। প্রথমে একটি তুলোটে আঁশ স্বাতীকে ছোঁয় যেন। আলতো। ফ্যাকাশে। ক্রমশঃ অজস্র কথা, অবিশ্রান্ত কথা গাঢ়। ঘন হয়ে স্বাতীকে ছুঁয়ে থাকে অঝোরে এবং তুমুল। সাদাটে তুলোর আঁশে ঢেকে যেতে থাকে সে। চিঠি দুই, চিঠি তিন, চিঠি চার চিঠি দশ ....

'Please, if ever you have any time to spare, will you remember again the lonely young man beside the door ...?' স্বাতী পড়ে – অখন্ড মনোযোগে পড়ে চলে। এলোমেলো বাতাস বয়। প্রাচীন ভাষা, প্রাচীন সময় ওড়ে – স্বাতীর দুহাতে মাঝখানে এসে থামে। 'It is only the hand that holds friendship which in time one does not need to shake away'। একলা মানুষের দৈনন্দিন জানছেন এক অসম্পর্কিত শ্বেতাঙ্গিনী – অরবিন্দ নেহরার লেডি সাহিব। তারিখবিহীন চিঠি সব। বিচিত্র। আচ্ছন্নকারী। প্রাচীন সময়, প্রাচীন রীতি-রাজনীতি – বর্ণবিদ্বেষ – সন্তানের অকালমৃত্যু – গান্ধী – অসহযোগ, গো ব্যাক সাইমন – স্ত্রী সর্বক্ষণ পুজোর ঘরে। 'So then, I came home, and here I am, reading over your last kind letter, and trying to forget my anxiety by writing to you . . .' স্বাতীর দুহাতের মাঝে এখন বার্মা মুলুক, শিলং পাহাড়, কলকাতা, মালাবার হিলস। এলোমেলো উড়ছে অজস্র তুলোর আঁশ। ঝরে পড়ছে। চিঠি কুড়ি তিরিশ, চল্লিশ সাদা তুলোর আঁশে ভরে যাচ্ছে ওর ঘরদোর, খাটবিছানা, কিচেন, স্টোভটপ, ওর আয়রনিং বোর্ড, কাঁচের জানালা, পাশের বাড়ির বাহারি গাছ। স্ট্রীটওয়াক, ল্যাম্পপোস্ট সাদা হয়ে যাচ্ছে ক্রমশঃ।

'Like the threads that go to make the pattern in a carpet, we are all mixed up with one another, black men, white men, yellow men. ... I like to think that through my pattern there runs a small golden thread, that makes it really quite smart, and that is your kindness to me, and your understanding, and your understanding, and our friendship and all that it has meant.'

আকাশ বলে আর কিছু নেই তখন। ঘন কুয়াশার মত তুলোর আঁশ সবখানে। চিঠি পঁয়তাল্লিশ, চিঠি পঞ্চাশ . . . . 'There is no one in my own small world to one I can talk of it with any certainty of being understood ...' বালিঘড়িতে সময় ঝরছিল – স্যান্ড ডিউন বেয়ে উটের সারি যাচ্ছিল কোথাও – সারিন্দায় ছড়ের চলন শুনছিল স্বাতী – 'The shadows fall, Lady Sahib. The shadows fall. I must wait until I hear upon the stairs the feet of one come to light my lamp ...'

– কতদিন কথা বলি নি সুদীপ, কত দিন . . . .

প্রাচীন ধুলো, মৃত মথ, ঝুরো পাতা ওর কোলে। কাগজকলম নিল ও।

সুদীপ,

আজ এই শীতের প্রথম বরফ পড়ল। চারদিক একদম সাদা . . . .

স্বাতীর ফোনটা যখন এল, কস্তুরীর তখন সকাল হয়েছে। সূর্য উঠছিল ওর বাঁদিকে। ওর ডানদিক থেকে একটা প্লেন উড়ান দিয়েছিল। মাথার ওপর প্লেন আর সামনে সূর্য নিয়ে ও হাঁটছিল। বাঁ হাঁটু খচ খচ করছিল সামান্য। তবু ও হাঁটছিল। যেন ওকে হেঁটে যেতেই হবে। যেন ওর হাঁটা ছাড়া গতি নেই। সেই সময় ফোন বাজতেই একটু দাঁড়িয়ে পড়ল ও। কথা শুরু করল কস্তুরীই।

– কিরে তুই এই সময় ? কাল তোকে ফোন করলাম। বেজে গেল। মেইল-ও নেই।

– কলেজে বেশ অনেকটা সময় দিচ্ছি আজকাল। ফিরেছি, দেরিতে, টায়ার্ড লাগছিল। না খেয়েই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। পরে দেখি তোর ফোন এসেছিল। যখন দেখলাম, তুই তখন ঘুমাচ্ছিস।

– কেমন লাগছে পড়াতে ? এতদিন পরে ?

বহুদিন পরে অসম্ভব উচ্ছ্বসিত হল স্বাতী ।

– ভীষণ ভালো লাগছে রে । ভীষণ ভালো । চ্যালেঞ্জিং । বাড়ি ফিরে রোজ ওকেও তাই লিখছি । স্টুডেন্টদের কথা কোলিগদের গল্প । আজ এই হল, ঐ হল ।

– রোজ লিখিস তুই সুদীপকে ?

– প্রতিদিন । একটা করে চিঠি । লম্বা চিঠি । সব লিখি তাতে । সব । সারাদিন কাজের মধ্যেই ভেবে যাই আজ এই লিখব । এই কথা লিখতে হবে । ঐ কথাটা বলা হয়নি । আজকাল মনে হয়, ওকে লেখার জন্যেই এত কাজ করি । সত্যি ।

– কি করিস চিঠিগুলিকে ?

– ফাইলে রেখে দিচ্ছি । থাক । কোনদিন এই এপার্টমেন্ট খালি করতে এলে কাজুরা পাবে ।

– এবছরে আসার দিন ঠিক করলি কিছু ? কবে আসছিস ? কাল এই কথাটাই জানতে ফোন করেছিলাম ।

– ঐ ডিসেম্বরের মাঝামাঝি । যেমন আসি । এবারে কেটে নেব টিকিট । তুই পেলি বইটা ?

– না, দোকানে পেলাম না । ক্রস ওয়ার্ডে খুঁজলাম । অক্সফোর্ডেও । ইন্টারনেটে অর্ডার করে দেব । কাল ইন্টারনেটে বইটা নিয়ে অনেক কিছু পড়ে ফেল্লাম । চিঠিগুলো সত্যিকারের নয় বোধ হয় ।

– জানি । . . . . এই কস্তুরী, শোন, এখন রাখি । কে যেন বেল বাজাচ্ছে ।

কি হোলে চোখ রেখে দেখে পিটার ।

– কেমন আছ দেখতে এলাম ।

– পিটার ! এসেছ তোমরা টের পেয়েছি । মাথার ওপর খুটুর খাটুর । তোমার মা কেমন আছেন ?

– এখন কিছুদিন রিহ্যাব সেন্টারে থাকতে হবে । তারপর ওল্ড এজে হোমে থাকবেন । অ্যাপার্টমেন্টটা বিক্রি করে দেব । জিনিসপত্র গোছগাছ করছি । পুরোনো বেশ কিছু ফার্নিচার তো ফেলেও দিলাম আজ ফুটপাথে । কাল কাউন্সিলের গাড়ি এসে নিয়ে যাবে । এখনও গোছাচ্ছি । কোনটা ফেলে দেব, কোনটা থাকবে । তারপর রং করিয়ে বিক্রি করে দেব । কি বলব তোমাকে কি যে জমিয়েছে আর কি যে জমায়নি বুড়ি . . . আজও কত কি বের করলাম । এক কাজ করো না ডিনারে এসো ওপরে । সব দেখাবো । অনেক রেকর্ড পেয়েছি । চিঠি বই । দেখাবো তোমাকে । মরিয়াও আছে । কাল তো শনিবার । তুমি সাতটায় চলে এস ।

দরজা বন্ধ করে ঘড়ি দেখে স্বাতী । বেশি সময় নেই । কি ভেবে ভ্যাকুয়াম করে ঘর । আবার ঘড়ি দেখে । কস্তুরীর নম্বর ডায়াল করে ।

– এই তখন ছেড়ে দিতে হল, পিটার এসেছিল ।

– কি বলছে ?

– ডিনারে ডাকল । আরো অনেক পুরোনো জিনিস পেয়েছে, দেখাবে ।

– দারুণ তো । ঘুরে আয় । দ্যাখ, ইন্টারেস্টিং কিছু পাস যদি । হয়তো পুরোনো চিঠি পেলি এক গোছা আর দেখলি পিটারের ঠাকুমাই আসলে অরবিন্দ নেহরার সেই মেমসাহেব । হতেও তো পারে ।

– গল্পে এমন হয় ।

– আর বাস্তবে ?

– ভাব্ তুই । আপাতত বাস্তব হল আমাকে একটু বেরোতে হবে – ফুল আর ওয়াইন নিয়ে আসি চট করে তারপর ওপরে যাব ।

– এখন বেরোবি ? ওয়েদার কেমন ? বৃষ্টি পড়ছে ? অবশ্য গাড়ি নিয়েই তো যাবি ।

– না গাড়ি নেব না । একটু প্রবলেম করছে, সার্ভিসিং করাতে হবে । হেঁটেই যাব । এই তো দশ মিনিট ।

– হাঁটবি ? বলছিলি যে তোর হাঁটুও আমার মতই ঝামেলা করছে ।

– সে রকম কিছু না । রাখি এখন ? রাতে মেইল করব ।

স্টেশনের পাশে ছোটো দোকান – চিনে দম্পতির । সেখান থেকে ফুল নিল স্বাতী । সে দোকানের একপাশে বুচার, অন্যপাশে ওয়াইন শপ তখনও শপ খোলা ছিল । রেড ওয়াইন নিল স্বাতী । একহাতে ফুল, অন্য হাতে কাগজে

মোড়া ওয়াইনের বোতল । প্রায় নিঝুম পাড়া । গৃহস্থের আঙিনায়, সিঁড়িতে মৃদু আলো । কুকুর ডাকছিল । বাঁদিকের দোতলা বাড়ির দোতলায় ঝমঝম পিয়ানো বাজছিল । এমন সময়ে জোরে বৃষ্টি এল । ভিজছিল স্বাতী । চশমার কাঁচ ঝাপসা হয়ে গেল । ওর একহাতে ফুল, অন্য হাতে ওয়াইন । এই রাউন্ড অ্যাবাউটটা পেরিয়ে ডানদিকের রাস্তা পেরোলেই ওর অ্যাপার্টমেন্ট । অ্যাপার্টমেন্টের আলো দেখা যাচ্ছিল । ফুটপাথে ডাঁই করা বাক্স, পুরোনো টেলিভিশন, রেডিও, আয়না । কাল কাউন্সিলের গাড়ি এসে নিয়ে যাবে । বৃষ্টিতে ভিজে যাচ্ছিল সব । এক দৌড়ে পৌঁছে যেতে চাইল স্বাতী । ওর হাঁটু অবশ হয়ে এল এই সময় আচমকা । স্টীল গ্রে ফোর্ডের ঈষৎ মাতাল ড্রাইভার যখন টার্ণ নিচ্ছিল প্রচন্ড জোরে, সে দেখতে পেল লংকোট, শাড়ি, একহাতে ফুল, হাঁটুমুড়ে বসে পড়ছে রাস্তায় । থামতে চাইল সে । ফোর্ডের চাকা স্কিড করল ভেজা অ্যাসফল্টে ।

ড্রয়িং রুমে টিভি চলছিল যথারীতি । মাইক্রো ওয়েভে রাতের খাবার গরম হচ্ছিল । দেওয়াল জুড়ে প্রাচীন সব ছায়া । নৈঃশব্দের অবয়ব স্পষ্ট ।।

কস্তুরী চিঠি লিখছিল ।

স্বাতী,

এখানে গরম পড়ে গেছে, জানিস ?

বইটা অর্ডার করেছিলাম অ্যামাজনে । এসে গেছে । ডিটেইলে লিখব । আজ হবে না । অনুপম আসবে এখনই । তোকে অনেক কিছু বলার আছে . . . .

সবুজ ফাইলটা পাশেই রাখা ছিল । ফাইল খুলল ও । দড়ি বাঁধা পুরোনো সবুজ ফাইল । সবুজ ওর প্রিয় রং । চিঠিটা ফাইলে ঢুকিয়ে আলতো গিঁট দিল কস্তুরী ।

গোরস্থানে হেমন্তের বিকেল

আনন্দ সেন

এখানে হলুদ আর লাল আকাশের দরজায়
এখানে আগুনের বুকে পাতারা মুখ লুকায় ।

এখানে পায়ে পায়ে পথ চলে গেছে বহুদুর
এখানে আঙ্গুলের ফাঁকে লুকোচুরি খেলে রোদ্দুর ।

শেষ হয়ে যাওয়া স্বপ্নেরা দল বেঁধে পরে পীতবাস
এখানে নরম মাটিতে মৃত্যুরা শুয়ে বারোমাস ।

এখানে দিনের কোলাহল এসে থেমে গেছে চুপ
এখানে ত্রস্ত হরিনের গালে চুমু খায় ছায়াধুপ ।

চলতে চলতে থমকে থেমেছি জংলা পথের পাশে
এখানে ফলক বসে আছে কথা ফুরনোর অভিলাষে ।

পাতা ঝরে যায়, সন্ধ্যা ঘনায়, জোনাকিরা বাতি জ্বালে
মরা আলো মেখে পাথরেরা শোনে, গল্পের কথা বলে ।

কারও ভালবাসা আসেনি জীবনে, কারও হাঁটা পথ সর্পিল
সুখ কারও সুরে ঝরনার জল, কারও রূপকথা ঝিলমিল ।

গল্প অনেক, অনেক জীবন, যাই বলে গেল কারা
বনতল মোড়া চাদরে আঁধার, পাহারায় থাকে তারা ।

পশ্চিম থেকে ছুটে আসে মেঘ, বাতাসে ঝড়ের সাজ
নামহীন কোন ফুলের গন্ধে পৃথিবী মেতেছে আজ ।

বৃষ্টিধারায় মিশে যেতে যেতে হাওয়ার শব্দ শুনি
মরণকে বাম পাশে রেখে আমি জীবনের দেনা গুনি ।

লিমেরিক

শুভ্র দত্ত

যুক্তি বুদ্ধি যে শেখাতে চায়, তারই পরে লোক খাপ্পা
মুক্তচিন্তা যে করে, সে পাবে ধর্মদ্রোহীর ছাপ্পা
আজ এ দেশের এমনই চেহারা
সে লোকগুলোই পুজো পায় যারা
নির্বিচারে ও দ্বিধাহীনভাবে দিচ্ছে তোমায় ধাপ্পা ।

*** **** ****

ওরে ভুটু তুই শুনলাম নাকি এবার দাঁড়াবি ভোটে
কি যে হবে তোর ! অঙ্কে তো তুই তেরো পেয়েছিলি মোটে
রাজনীতি ঠিক বুঝি না - তা মানি,
তবু শুনেটুনে যতদূর জানি,
জটিল অঙ্ক প্যাঁচ নাকি লাগে রাজনৈতিক জোটে ।

*** **** ****

পুষ্পশোভিত গাছ তো দেখেছ, দেখেছ কি তার মূলটা ?
গাছের মতন সে প্রায়, যদিও সোজা নয়, ঠিক উলটা
নিজেকে লুকিয়ে চোখের আড়ালে
ভূতল গভীরে অতল পাতালে
মাটির রস সে যোগায় বলেই ডালে ফোটে ঐ ফুলটা ।

গল্প

শোওন

শাশ্বতী ভট্টাচার্য

কলকাতা থেকে প্রায় একশো আশি কিলোমিটার দূরে বোলপুরের কাছাকাছি আমাদের ছোট্ট শহর সস্থিপুরে কোন ঝুটঝামেলার স্থান ছিল না । আমরা বেশ ভালো ছিলাম । আমরা মানে রবি, শ্রীকুমার, মল্লিকা আর মাধবী, অন্ততঃ যতদিন না হুট করে শোওন নামে এক উপদ্রপের আবির্ভাব হলো ।

তখন বারো ক্লাস চলছে, আর মাত্র কয়েক মাস বাদেই উচ্চ মাধ্যমিক ফাইনাল পরীক্ষা নামের সেই কঠিন দিনগুলোর সমাগম হবে, তার মাস তিনেক বাদে পরীক্ষার ফলাফল বেরোবে; কৈশোরের স্বর্ণযুগ শেষে আমরা কে যে কোথায় ছিটকে চলে যাবো কে জানে ! সম্ভবতঃ শ্রীকুমারকে যুতে দেওয়া হবে ওদের তিন-পুরুষের পারিবারিক বস্ত্র ব্যবসার লাঙ্গলে, উচ্চশিক্ষার জন্য আমি চলে যাব কলকাতায়; মেসবাড়ি থেকে পড়াশোনা চালাবো । আমাদের ক্লাসের দুই মধ্যমণি মাধবী আর মল্লিকা কি করে, বা কোথায় যায় এই নিয়ে ওদের অজান্তে কিছু ইচ্ছা আর চিন্তাভাবনা আমি আর শ্রীকুমার পুষে রেখেছি অনেক দিন ধরে । তাই এই পরীক্ষা আর তার ফলাফলের ওপর অনেক কিছু নির্ভর করছে ।

সাধারণ সামাজিক নিয়মে শোওনকে নিয়ে আমার মাথা ব্যথা হওয়ার কথা নয় । আমি স্কুলের ফুটবল টীমের ক্যাপ্টেন, ক্লাস ফাইভ থেকে ক্লাস টুয়েলফ অবধি প্রতি বছরেই ক্লাসে হয় ফার্স্ট কিম্বা সেকেন্ড হয়ে এসেছি । হায়ার সেকেন্ডারীতেও ভালো ফলাফল হবে বলে আশা করছি । আর শোওন আমাদের শহরের একমাত্র ইংলিশ মিডিয়াম সহশিক্ষা স্কুলের দারোয়ান-বেয়ারা-আর্দালী । এইটুকু জানি শোওন ঘড়ি দেখতে জানে, বাংলা-ইংরাজীর অক্ষর জ্ঞান আছে, এক থেকে একশো গুণতে জানে । কিন্তু মুশকিলটা হলো, শোওন উচ্চতায় প্রায় পাঁচ নয়, তার মানে আমি ওর থেকে দুই ইঞ্চি কম । আরও আছে, ওর মুখে এক অদ্ভুত শিশুসুলভ সরলতা, অথচ কাজ যখন করতে এসেছে, ও তো বয়সে আমাদের থেকে ছোট হতে পারে না । আর ওর গলার স্বরটা অদ্ভুত রিনরিনে । বিশেষ একটা কথা ও বলে না । কিন্তু যখন বলে, তখন ওর সাধারণ কথাবার্তাও এমন শ্রুতিমধুর লাগে, মনে হয় যেন আমাদের গাছ-পালা, পাখিরাও তাতে সাড়া দিতে পারে । এর পর আছে ওর গ্রীক দেবতার ছাঁচে তৈরী চেহারা । কি জানি কি পরিমান পাথর বা মুটে বওয়ার অভিজ্ঞতা ওর আছে, আমার ভোর-রাত্রে উঠে প্রতি সকালে চার মাইল দৌড়ে অর্জন করা কাফ মাসল্ কিম্বা নিয়মিত ব্যায়াম করা ডনবৈঠক মারা বাইসেপ কিম্বা ট্রাইসেফ ওর সামনে নিহাত ফেকলু বনে যায় । না, আমি একাই এই সব লক্ষ্য করিনি । আমাদের স্কুলের ক্লাস ফাইভ থেকে টুয়েলভ্ অবধি ছেলে মেয়ে নির্বিশেষে প্রত্যেক ছাত্র ছাত্রীই সেটা লক্ষ্য করেছে, সেটা আমি হলফ করে বলতে পারি । আমার তো মনে হয়, আমাদের ইতিহাসের শিক্ষিকা চামেলীদি বা বাংলার শিক্ষিকা ললিতাদিও কম যান না । ওঁনারাও শোওনকে একটু বেশী মাত্রায় প্রশয় দিচ্ছেন । সস্থিপুর শহরের নামজাদা চিকিৎসকের একমাত্র সন্তান আমি শোওনের সামনে হ্যাজাকের কাছে লম্পোর মতো, টিমটিম করি । ঈর্ষা ? হ্যাঁ, একে যদি ঈর্ষা বলে, আমি ঈর্ষা-কাতর ।

এই গোলমেলে পরিস্থিতির শুরুটা কিন্তু ছিলো নেহাতই মামুলি ।

প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে ক্রমাগত কাজ করার পর অগুন্তি ছাত্র-ছাত্রীর মাসী, অগুন্তি শিক্ষক-শিক্ষিকাদের দিদি, আমাদের এই সমগ্র স্কুলের পরিচারিকা, শীতলাদি গত বছর অবসর নেন । উনি না শুনতে পেতেন কানে, না পারতেন ভালো করে হাঁটতে, সারাদিন প্রায় জুবুথুবু হয়ে প্রিন্সিপাল ডঃ অবনী সান্যালের অফিসের সামনেই বসে থাকতেন । তাই স্কুল শুদ্ধ সমবেত আলোচনা করে ঠিক করা হলো যতদিন নতুন কাউকে না পাওয়া যায় বিভিন্ন ক্লাস থেকে হোম-ওয়ার্কের খাতা বওয়া, টিফিনের সময় স্কুলের ক্যান্টিন থেকে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জন্য চা-কফি ওমলেট, টোস্ট ইত্যাদি বানিয়ে আনা, স্কুলের বিভিন্ন ক্লাসের শেষে প্রহরে প্রহরে ঘন্টা বাজানোর মতো কাজগুলি বিতরণ করে দেওয়া হোক ক্লাস টুয়েলভ্-এর ছাত্র মানে আমাদের মধ্যে । স্কুল ক্যাপটেন হওয়ার দরুণ আমার ওপর ভার ছিলো ছাত্র জোগাড় করে কাজগুলো সময় মতো করা ।

আমিও খুশি হয়ে রাজী হয়ে গেলাম । তখন বুঝিনি কি কেঁচাকলে পা দিলাম ।

প্রথম দুই সপ্তাহ বেশ ভালোই গেলো, কাজ করা মানে যে ক্লাস থেকে রেহাই, ভীড় করে সবাই কাজ করতে চায়; কিন্তু উৎসাহে ভাঁটা পড়তে দেরী হলো না । এক মাস হতে চলেছে, ততদিনে আমি ছাত্র যোগাড়ের আশা ছেড়ে দিয়েছি । কি করি ? ছোটাছুটি করে আমি একাই সব সামাল দিতে শুরু করলাম । সকাল দশটা থেকে বিকেল পাঁচটা, শীতলা মাসীর ঘরটাকে আমার সাময়িক থাকার ব্যবস্থা করলাম । পড়ার যাবতীয় বই খাতা সরিয়ে আনলাম মাসীর ঘরে যাতে আমি টিফিনের সময়টা বাদ দিয়ে উচ্চ মাধ্যমিকের জন্য পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পারি । প্রথম মাসটা বেশ ভালোই গেলো, নিরিবিলিতে বসে পড়ার সুযোগ পেয়ে গেলাম । ক্লাসের ফাঁকে ফাঁকে শ্রীকুমার এসে দেখা করে যায়, স্কুলের অন্দর মহলের কথা জানিয়ে যায় । জানতে পারলাম আমাকে নিয়ে ক্লাসে, খেলার মাঠে, স্কুলের ক্যান্টিনে, শিক্ষক শিক্ষিকাদের মধ্যে নানা প্রশংসা-সূচক আলোচনা হচ্ছে । সবাই অভিভূত, ক্লাস এইটের অরিন্দম নাকি বলেছে বড়ো হয়ে ও রবি দাদার মতো হতে চায় । তারপর এক শুক্রবার দুপুরবেলায় বহু অভিপ্রেত সেই দিনটা এলো । একরাশ সুগন্ধ আর প্রাণ জুড়ানো স্নিগ্ধতা নিয়ে দুটো ক্লাসের মধ্যের সময়টুকুতে মল্লিকা আমার সাথে প্রায় কুড়ি মিনিট কাটিয়ে গেলো শীতলা মাসীর ছোট্ট ঘরে । বলে গেল আবার আসবে । কিন্তু আমার আনন্দাকাশের ঈশান কোণে যে মেঘ জমতে শুরু করেছে আমি বুঝতে পারিনি ।

টিফিনের সময় যখন উনানে কুড়ি কাপ চা ফুটছে, ক্লাস ফাইভের রেবেকা আর মঞ্জরীর ভেঙ্গে যাওয়া ব্যাডমিন্টনের র‍্যাকেট সারিয়ে দিতে হলো । আঠা দিয়ে ভালো করে কাপড় দিয়ে বেশ করে র‍্যাকেট গুলো ওদের হাতে দিয়ে নায়কোচিত গলায় বললাম ‘এখনই খুলিস না, কাল অবদি এটাকে জোড়ার সময় দিতে হবে’ । ওরা সবে গেছে, মাধবী হঠাৎ কোথা থেকে এসে দূতিগিরি করে গেলো বলে গেলো, মল্লিকা আজ স্কুল ছুটির পর ওদের বাড়ি যেতে বলেছে আমায় । ‘‘বলো কি হে ?’’ আমি আকাশে ভাসতে ভাসতে ওকে পাল্টা প্রশ্ন করলাম, ও বেনী নাড়িয়ে ফিক করে হেসে সবে বললো ‘‘যাই আমি’’ । ঠিক তখনি দড়াম করে হাজির হলো ক্লাস সেভেনের নবীন । বিপ্লবের হাত কেটে গেছে । ফার্স্ট এইড বাক্স নিয়ে ছুটলাম সেখানে . . . ., ফিরলাম যখন বিরাট কেটলীর জল ফুটতে ফুটতে প্রায় দুই কাপ জল পড়ে আছে বা কি, টোষ্ট পাঁউরুটি-গুলো খাওয়ার অবস্থায় নেই । সব ফেলে দিয়ে আবার কেঁচে গন্ডুস করতে হলো ।

ছুটির পরে আমি সোজা প্রিন্সিপালের ঘরে হাজির হলাম । উনি অনেক রাত অব্দি স্কুলে কাজ করেন । ‘স্যার আমাদের একটা শক্ত-পোক্ত আর্দালী চাই, ছেলে হলে ভালো হয়, কাল থেকে আমি ওই কাজ আর করছি না’ । অবনী স্যার চুপ করে সব বৃত্তান্ত শুনলেন । ‘‘আর একটা সপ্তাহ চালিয়ে নিতে পারবি না রবি ?’’ আমি কোন রকমে মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলে বাড়ি ফিরে এলাম, মনে পড়লো মল্লিকা আজ আমায় ডেকে ছিল । কিন্তু তখন রাত অনেক ছুটি ফুরিয়ে গেছে ।

কে জানতো পরেরদিন সকালেই অবনীবাবু এক এ্যপেলোকে এনে হাজির করবেন আমাদের স্কুলের বিরাট হলঘরে ? প্রতি সকালের জমায়েতে অন্য সব দিনের মতো প্রার্থনা গান হলো, ছাত্র ছাত্রীরা এই বার লাইনে দাঁড়িয়ে, নীচু থেকে উঁচু ক্লাস অনুযায়ী একজন করে করে হলঘরের পিছনে দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাবে । অবনীবাবু হাত তুলে আমাদের সবাইকে অপেক্ষা করতে বললেন, একবার আমাদের আর একবার উপস্থিত শিক্ষিকার দিকে তাকিয়ে ঘোষণা করলেন, আমাদের সবার আর্জি মত আমাদের মনের মত এক আর্দালী উনি যোগাড় করেছেন । আমরা আনন্দে হাততালি দিতে শুরু করলাম, হলঘরে সামনের দরজা দিয়ে নায়কের মতো প্রবেশ করলো শোওন । সারা হল ঘরে সমবেত বিস্ময়-মিশ্রিত প্রশংসার নিস্তব্দতাটা এখনও আমার কানে লেগে আছে । আমার পাশেই ছিলো মল্লিকা । আমি সন্তর্পনে ওর হাত ছুঁতে চেষ্টা করতেই ও হাতটা সরিয়ে নিলো ।

সেই শুরু । শীতলা মাসীর ঘর খালি করে আমার বই খাতা আবার আমাদের বাড়িতে নিয়ে চলে এলাম, ওইখানেই শোওনের থাকার জায়গা হলো, ও একা মানুষ; ওই টুকু জায়গাতেই ওর কুলিয়েও বেশী ।

আমার বাবা মা খুশী হলেন, কিন্তু বলা যেতে পারে সেই দিন থেকেই শুরু হলো আমার জীবনের নিরুত্তাপ, অনুরাগহীন বিষাদজনক দিন । সবাই যেন শোওনকে নিয়ে মেতে উঠল, স্কুলের সব কিছু কাজ শোওন কতো ভালোবেসে, কত কম সময়ে, কেমন হাসি মুখে করে ফেলে, বলার আগেই কি সুন্দর বুঝে যায় কি করতে হবে, এই নিয়ে আলোচনা সব জায়গায় হতে থাকলো । স্কুলের গন্ডী ছাড়িয়ে সেই আলোচনা চলতে থাকলো সস্থিপুরের হাটে বাজারে । স্কুলের ক্লাস

ফাইভের মেয়েরা লুকিয়ে চুরিয়ে ওকে দেখে, কিন্তু ক্লাস নাইন টেন কিম্বা ইলেভেনের ছাত্রীদের ওই সবের বালাই রইলো না। আমি যে আছি, আমি যে এই সস্থিপুরের একজন সেটা সবাই যেন ভুলেই গেছে।

সবাই, কিন্তু শ্রীকুমার নয়। ও আমার সাথে নিয়মিত দেখা করে, আমরা একসাথে অঙ্ক কষী, গান-বাজনা করি, বাঁকুড়ার লাল মাটিতে মাইলের পর মাইল দৌড়াই। সেই রকম একদিনে আমি আর শ্রীকুমার মিলে একটা ছক করলাম। শোওনকে সবার সামনে জুঝতে হবে। পরের দিন সকালের জমায়েতের আগেই অবনীবাবুর কাছে পেশ করলাম আমার প্রস্তাব, স্কুলের বর্ষপূর্তি দিবস উপলক্ষে একটা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হওয়ার প্রস্তাব দিলাম। উনি সানন্দে রাজী হতেই শ্রীকুমারকে গিয়ে জানালাম। আনন্দের আতিশর্য্যে স্কুল মাঠ ঘিরে দুটো দৌড় দিয়ে দিলাম আমরা।

দেখতে দেখতে সেই দিনটা এসে গেল। ক্লাস টেনের মেয়েরা মিলে নাটক মঞ্চস্থ করলো। শ্রীকুমার কালোয়াতি গান গাইলো, ওর গলার কারসাজী শেষ হতে আমি ফুটবল নিয়ে নানা কসরত দেখালাম। একবার পা থেকে মাথায় আবার তাকে হেড দিয়ে পায়ের পাতায়। একবারে স্থির করে রাখা দেখালাম। হাততালিতে হলঘর তখন ফেটে পড়েছে। আমি সুযোগ বুঝে মাইকে ঘোষণা করে দিলাম ''এবার আমাদের সবার অতি প্রিয় শোওন একটা বাঙলা গান গাইবে''। না, ঠিক এটাই আশা করিনি, কিন্তু মনে হচ্ছে কাজ হয়েছে। আমার একটা ঘোষণায় মুহূর্তের মধ্যে হল ঘরে নেমে এলো এক অচেনা নিস্তব্ধতা। সামনের সারিতে বসে ছিলেন শিক্ষক-শিক্ষিকার দল, তাদের নীরব তীব্র তিরস্কার হজম করে শোওনকে আবার ডাক দিলাম। কোনার দিকে মল্লিকার চোখে চোখ পড়তে ও ঘৃণায় মুখ সরিয়ে নিলো। আবার শোওনকে ডাকতে যাবো, দেখি হলের একেবারে পিছনের সারি থেকে ও হেঁটে হেঁটে আসছে। ওর পরণে এক সোনা রঙ্গে রাঙ্গানো ধুতি। হলে তখন একটা পিন পড়লে শোনা যাবে, এই নিস্তব্ধতা আনন্দের, অধীর আগ্রহের নিস্তব্ধতা। আস্তে করে আমার হাত থেকে মাইকটা নিয়ে শোওন গাইতে শুরু করলো। ''আমি পথভোলা এক পথিক এসেছি, সন্ধ্যাবেলার চামেলি গো, সকালবেলার মল্লিকা, আমায় চেন কি ?'

মল্লিকা, আমার মল্লি কোনা থেকেই গলা মিলালো ''চিনি তোমায় চিনি, নবীন পান্থ - বনে বনে ওড়ে তোমার রঙিন বসনপ্রান্ত। ফাগুন প্রাতের উতলা গো, চৈত্র রাতের উদাসী তোমার পথে আমরা ভেসেছি''।

শোওন ওকে গাইতে দিয়ে পরের ছত্রে চলে গেলো ''ঘরছাড়া এই পাগলটাকে এমন ক'রে কে গো ডাকে করুণ গুঞ্জরি, যখন বাজিয়ে বীণা বনের পথে বেড়াই সঞ্চরি''। মঞ্জরী দূরে কোথায় ছিল, ছুটতে ছুটতে এসে স্টেজের নীচে এসে দাঁড়ায়, সেইখান থেকেই গেয়ে ওঠে, ''আমি তোমায় ডাক দিয়েছি ওগো উদাসী, আমি আমের মঞ্জরী, তোমায় চোখে দেখার আগে, তোমার স্বপন চোখে লাগে, বেদন জাগে গো - না চিনিতেই ভালো বেসেছি''।

শোওন মৃদু হাসে, ওর চোখ আদ্র, ''যখন ফুরিয়ে বেলা, চুকিয়ে খেলা, তপ্ত ধুলার পথে যাব, ঝরা ফুলের রথে, তখন সঙ্গ কে লবি ?'

মাধবী ওর হাত থেকে মাইকটা নেয়, লম্বা বেণী নাড়িয়ে যোগ দেয়, ''লব আমি মাধবী'' তারপরে আবার শোওনের হাতে সেটা ফেরত দিয়ে ধীর কদমে হেঁটে গিয়ে মল্লিকার পাশে গিয়ে দাঁড়ায়।

শোওন গেয়ে চলেছে, ''যখন বিদায়-বাশিঁর সুরে সুরে শুকনো পাতা যাবে উড়ে সঙ্গে কে রবি''।

''আমি রব, উদাস হব ওগো উদাসী, আমি তরুণ করবী'' শ্রীকুমারের বোন না ? করবীকে আমি সাঁতার শিখিয়েছি, সাইকেল চালানো শিখিয়েছি। ওর কি মনে আছে সেই সব কথা ? সারা হল ঘর যেন সম্মোহিত হয়ে আছে, তার মধ্যে শোওনের অশ্রুতপূর্ব গলায় বহুদিনের চেনা গান বাজতে থাকে, ''বসন্তের এই ললিত রাগে বিদায়-ব্যথা লুকিয়ে জাগে - ফাগুন দিনে গো, কাঁদন-ভরা হাসি হেসেছি'' আমারও কেমন যেন একটা কান্না পেয়ে যায়।

কোথায় একটা ঢং ঢং করে ঘন্টা বেজে ওঠে, ''এই রবি ঘুমিয়ে পড়েছো ? বসন্তোৎসবে যাবে না ? দূর এমন সুন্দর বসন্তের দিনে এই বিকেল বেলা কেউ ঘুমোয় নাকি ?''

মল্লিকা আমার সামনে দাঁড়িয়ে, ওর পিছনে শ্রীকুমার, মাধবী আর করবী। মল্লিকার সদ্য স্নাত সুন্দর মুখে বিকেলের নরম আলো এসে পড়েছে। বাসন্তী রঙের শাড়ির সাথে কচি কলাপাতা রঙের ব্লাউজে ওকে অপরুপা দেখাচ্ছে। আমি চোখ কচলে, আমার বেসুরো গলায় গেয়ে উঠি ''আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে'' না উঠে উপায় আছে ? চলো কোথায় যেতে হবে !

মন চায়

অনিতা মুখোপাধ্যায়

পাখী, ও পাখী একটু দাঁড়াও
আমি যাব তোমার সাথে
মন যে আমার যাচ্ছে ছুটে
ঐ নীল আকাশের পথে ।
মনটা আমার লাগাম ছাড়া
ভাসতে চায় দূরান্তরে,
সাদা মেঘের ভেলায় চড়ে
নীল আকাশের ও প্রান্তরে ।
সারাদিন মেঘের সাথে
খেলবো নানা রঙ্গে,
মেঘও তখন ভালবেসে
নেবে আমায় সঙ্গে ।
ও পাখী, বল তো আজ
আর কি করার আছে,
নীল আকাশে তোমার কি
প্রিয়তমাও আছে ?
তোমরা দুজন মিলবে সেথায়
নানান রঙের ছন্দে
আমিও আমার মেঘের সাথে
ভাসব মনের আনন্দে ।

পাঞ্জাবের দুই ঝলক

স্বপ্না ব্যানার্জী

ভারতবর্ষের অনেক জায়গায় ঘোরার সৌভাগ্য হলেও তার একটি প্রদেশে আমার আগে কখনও যাওয়া হয় নি সেটি হচ্ছে পাঞ্জাব। এবছর, অর্থাৎ ২০১৫ সালের জানুয়ারী মাসে দেশে ঘোরার সময় আমরা হিমাচল প্রদেশের সঙ্গে সঙ্গে পাঞ্জাবেও যাব ঠিক করলাম। 'আমরা' মানে পতিদেব ও দুই ছেলেকে নিয়ে চারজন। ছেলেরা দুজনেই অনেক দূরে থাকে, তাই ওদের নিয়ে এরসঙ্গে বেড়াতে যাওয়া আজকাল খুবই বিরল হয়ে দাঁড়িয়েছে। এবারের যাত্রাটি বিশেষভাবে আনন্দময় হয়ে ওঠার সেটা একটা বিশেষ কারণ ছিল।

প্রথমেই আমাদের বিমানযোগে কলকাতা থেকে দিল্লী হয়ে চন্ডীগড় যাবার কথা। যাত্রার শুরুতেই বিড়ম্বনা দেখা দিল। দিল্লী থেকে এয়ার ইন্ডিয়ার flight cancelled হল কুয়াশার জন্য। চন্ডীগড়ে আমাদের হোটেল ঠিক করা ছিল। তার বদলে আমাদের রাত কাটাতে হল দিল্লীতে। পরের দিন এয়ারপোর্টে গিয়ে জানলাম সেদিনও প্লেন যাবে না। এদিকে চন্ডীগড়ে আমাদের হোটেল ও গাড়ী অপেক্ষা করছে — বহু জায়গায় ঘোরার পরিকল্পনা। পুরো প্ল্যান গোলমাল হয়ে যাচ্ছে শুরুতেই। শেষকালে আমরা ঠিক করলাম যে দিল্লীতে আর বসে না থেকে আমরা অন্য কোনওভাবে চন্ডীগড়ে যাবার চেষ্টা করব। আর কিছুর ব্যবস্থা করতে না পেরে আমরা বাসে করে চন্ডীগড় ও রওনা হলাম। বাসে মোটামুটি ভাল ব্যবস্থা

থাকা সত্বেও আমাদের সারাদিন লেগে গেল যেতে। গভীর রাতে আমাদের ড্রাইভার চন্ডীগড় বাস স্টেশন থেকে আমাদের হোটেলে নিয়ে গেলেন। পরেরদিন বেলা এগারোটায় আমাদের Toy Train ধরে সিমলা যাবার কথা। চন্ডীগড়ে কিছুই দেখা হল না বলে আমার খুব মন খারাপ। সেটা শুনে আমাদের ড্রাইভার বললেন, ''ট্রেন পকড়নে কে পহলে দো তিন ঘন্টেমে আপ তো সির্ফ এক হি জগহ দেখ সকেঙ্গে। আপ লেক দেখনে যা সকতে, লেকিন লেক তো আপ বহুত হি দেখে হোঙ্গে। আওর মন্দির তো আপ সভী জশহ দেখ সকেঙ্গে। লেকিন এক চীজ আপ কহী আওর নহি দেখেঙ্গে — ও হ্যায় Rock Garden। চলিয়ে আপকো ওহি দীখানে লে চঁলে।''

কথাটা যে কত সত্যি তা আমরা সেখানে গিয়েই বুঝতে পারলাম । এই ''পাথরের বাগান'' ১৯৫৭ সালে নেক চাঁদ বলে এক সরকারী অফিসের কর্মী কাজের পরে তাঁর অবসর সময়ে তৈরী করতে শুরু করেন । প্রায় চল্লিশ একর জায়গা জুড়ে এই বাগান তৈরী হয়েছে ফুল দিয়ে নয় । ফেলে দেওয়া আবর্জ্জনা, পুরোনো লোহালক্কড় এবং ভাঙা পাথর দিয়ে । অসাধারণ শিল্পপ্রতিভার অধিকারী এই সাধারণ মানুষটি তাঁর কল্পনার মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছেন এক অনন্যসাধারণ ভাস্কর্য্যের সংকলন, যার তুলনা পৃথিবীর আর কোথাও আছে বলে আমি জানি না । আজকাল এদেশে recycling কথাটার খুব চল হয়েছে । ভারতীয়দের কাছে এটা খুব নতুন ধারণা নয় । আমাদের গরীব দেশে কোনও জিনিষই ফেলা যায় না । তবে আবর্জ্জনা দিয়ে কার্য্যোপযোগী পার্থিব জিনিষ তৈরী করা আর সুন্দর শিল্পকলাদি সৃষ্টি করার মধ্যে তফাৎ আছে । ভাঙা কাঁচের বোতল, পুরোনো লোহালক্কড়, ভাঙা কাঁচের চুড়ি, fluorescent tube । ভাঙ্গা সাইকেল, এমন কি ভাঙ্গা toilet-এর মধ্যেও যে সৌন্দর্য্য আছে তা জানতাম না । ১৯৭৬ সালে সরকার জনসাধারণের উপভোগের জন্য এই বাগানটি উৎসর্গ করেন এবং নেক চাঁদকে তাঁর কাজ চালিয়ে যাবার জন্য অর্থ

এবং জনবল দিয়ে সাহায্য করেন । আজ প্রতিদিন পাঁচ হাজারের উপর লোক এই বাগানটি দেখতে আসেন । গত জুনমাসে ৯০ বছর বয়সে নেক চাঁদের দেহান্ত হয়, কিন্তু এই বাগান তাঁর অমর স্মৃতিসৌধ হয়ে থাকবে ।

এই বাগানটি তৈরী হারিয়ে যাওয়া এক কাল্পনিক স্বপ্নরাজ্যের অনুকরণে । অসংখ্য ছোট ছোট কুঞ্জবন, তোরণশোভিত পথ, দালাল, দরজা ইত্যাদির পথ চলে গিয়েছে খোলা প্রশস্ত অঙ্গনের দিকে । স্বপ্নরাজ্যের চৌদ্দটি সভাগৃহ ।

তার কোথাও বা সঙ্গীতশিল্পীরা জমায়েৎ হয়েছেন বাদ্যযন্ত্রাদি, নিয়ে কোথাও বা রাজার দরবার বসেছে, কোথাও রাণীর স্নানের ঘরে স্বচ্ছ জলের সরোবর, কোথাও বা দেবদেবীরা প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন, আবার কোথাও জীবজন্তুদের

সভা বসেছে। বাগানের মাঝখানে ঝর্ণা, জলপ্রপাত, পাহাড়, খোলা নাট্যশালা। পায়ে চলা সেতু গিয়েছে কুঞ্জবনে। চতুর্দিকে ভাঙা চীনেমাটির টুকরো দিয়ে মোজাইক-এর নক্সা করা। নেক চাঁদের বাগানে যাঁরা সাবেকী শিল্পকলার সন্ধানে যাবেন, তাঁরা কিন্তু নিরাশ হবেন। গতানুগতিক প্রথায় নির্মিত শিল্পকার্য্যের সঙ্গে তাঁর ভাস্কর্য্যের তুলনা করা চলে না, কারণ তাঁর শিল্পের উপকরণ বা মাধ্যম সবই অভূতপূর্ব। তাঁর নিজস্ব রচনাশৈলী খুবই বৈশিষ্ট্যপুর্ণ ও প্রগতিশীল। তাঁর বিমূর্ত চিত্রকলা বা abstract art আমাকে Picassoর শিল্পকলার কথা মনে পড়িয়ে দিয়েছে বারবার, যদিও এ ব্যাপারে আমার জ্ঞান খুবই সামান্য। হাতে মোটে দুঘন্টা সময় ছিল। তাতে কিছুই ভাল করে দেখার সাধ মিটল না। যতটুকু দেখলাম তা অসাধারণ স্মৃতি হয়ে থাকবে।

এর পরে কয়েকদিন ধরে আরও অনেক নতুন জায়গা দেখলাম যার বর্ণনা স্থানাভাবে দেওয়া সম্ভব নয়। তবে পাঞ্জাব সম্বন্ধে কোনও রচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে যদি না আমি সেখানকার সবচেয়ে বিখ্যাত দ্রষ্টব্যস্থলের কথা লিখি। অমৃতসরে শিখদের স্বর্ণমন্দিরে যাবার আমার অনেকদিনের শখ ছিল। কল্পনা সীমাহীন। বিশেষকরে তা যখন অনেকদিন ধরে মনের মধ্যে সযত্নে প্রতিপালিত হয়, তখন তা অনেকসময় বাস্তবকে ছাড়িয়ে যায়। সেক্ষেত্রে বাস্তব আমাদের নিরাশ হতে বাধ্য করে। স্বর্ণমন্দির কিন্তু তার ব্যতিক্রম। শিখধর্মের পবিত্র এই গুরুদ্বারাটি (হরমন্দির সাহিব) তৈরী হয় ষোড়শ শতাব্দীতে। প্রথমদিকে মুসলমান সৈন্যবাহিনীর আক্রমণে বারকয়েক এই মন্দির ধ্বংস হয়ে যায়, কিন্তু ভক্তরা আবার তাকে আগের থেকেও সুন্দর করে গড়ে তোলেন। ১৭৬৭ সালের পর থেকে এই মন্দির আর গুরুতরভাবে আক্রান্ত হয় নি। ১৯৮৪ সালে সাম্প্রদায়িক অশান্তির সময়ে এই মন্দিরে ভারতীয় সেনাবাহিনীর সঙ্গে চরমপন্থী শিখ সংগ্রামীদের যে মোকাবিলা হয়েছিল তার কোনও লক্ষণ কোথাও দেখলাম না। এই ঘটনার মর্মান্তিক উপসংহার কারোরই অজানা নয়। এ ব্যাপারে দুপক্ষেরই অনেক মতবাদ আছে, তবে আমি সেই বিতর্কমূলক আলোচনায় যেতে চাই

না। শিখসম্প্রদায় তেজস্বী যোদ্ধার জাত। প্রথমে মুসলমান শাসক ও পরে নানাসময়ে ইংরেজ ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের হাতে ধার্মিক নির্যাতনের বিরুদ্ধ তাঁরা সবসময়েই নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে তৈরী। কিন্তু এই মন্দিরে দেখে এলাম তাঁদের আরেক রূপ সে রূপ যোদ্ধার নয়, এখানে তাঁদের রূপ আত্মোৎসর্গকারী ভক্তের, বিনীত সেবকের।

এই মন্দিরের স্থাপত্যে মুসলমান ও হিন্দু ঘরাণার অপূর্ব সমন্বয় দেখা যায়। বাইরে থেকে প্রথমে চোখে পড়ে সাদা মার্বেলের চারটি প্রবেশদ্বার। ঢোকার মুখে সকলে জুতো খুলে স্বচ্ছ জলের ধারাতে পা ধুয়ে ভেতরে ঢোকেন। স্ত্রীপুরুষ নির্বিশেষে সকলের মাথা ঢাকতে হয়। মাঝখানে অমৃত সরোবরের টলটলে জলে রংবেরঙের মাছ ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই সরোবরের চারদিক ঘিরে সাদা মার্বেলের খিলান পরিক্রমা করে গুরুসেতুতে উঠে সরোবরের মাঝখানের প্রধান মন্দিরে ঢুকতে হয়। সেতুর মুখে কারুকার্য্য করা রুপোর দরজা, তার নাম দর্শণী দেউড়ী। মন্দিরের নাম হরি মন্দির বা দরবার সাহিব। এই মন্দিরের চূড়া মহারাজ রঞ্জিত সিং নাকি ১০০ কিলোগ্রাম (এ ব্যাপারে মতান্তর আছে — ৭৫০ কিলোগ্রামও পড়ছি কোথাও) সোনা দিয়ে মুড়ে দিয়েছিলেন। সোনার গিল্টি করা মন্দিরে সূর্য্যের আলো ঠিকরে পড়ছে, অমৃত সরোবরে তার ছায়া কেঁপে কেঁপে উঠছে। অপূর্ব সেই দৃশ্য। হাজার হাজার ভক্তরা এই সেতু দিয়ে মন্দিরের ভেতরে ঢুকে তার গর্ভগৃহ প্রদক্ষিণ করছেন। সেখানে বসে অবিরাম গ্রন্থ সাহিব পড়ছেন গ্রন্থী সিং (জ্ঞানীজী)। ভক্তরা ছাতে বসে, বা চারপাশের চত্বরে বসে প্রার্থনা করছেন। পুরুষেরা অনেকেই জলে নেমে ডুব দিচ্ছেন। কোথাও কোনও হুড়োহুড়ি, গুঁতোগুতি বা চ্যাঁচামেচি নেই। এক অপূর্ব শান্তির পরিবেশ।

তবে এই মন্দিরের শুধু যে আধ্যাত্মিক আকর্ষণ আছে তাই নয়। জাতিধর্ম সকলের এই মন্দিরে অবারিত দ্বার।

এঁদের ''গুরু কা লঙ্গর'' জগৎ বিখ্যাত। সেখানে নাকি দিনে ৩৫০০০ থেকে ১০০০০০ লোককে এঁরা বিনামুল্যে খাদ্য পরিবেশন করেন। বিশাল হলঘরে সকলে একসঙ্গে মাটিতে বসে খাচ্ছেন। তাঁদের খাবার পরিবেশনের ব্যবস্থা একবারে assembly line-এর মতো ক্ষিপ্রতায় চালিয়ে চলেছেন শতশত স্বেচ্ছাসেবকরা। শুনেছি মুসলমানদের যেমন জীবনে অন্তত একবার মক্কাতে তীর্থ যাত্রা করার কথা, সব শিখদের সেরকম জীবনে অন্তত একবার স্বর্ণমন্দিরে এসে সকলের সেবা করার কথা। এই কাজ করার জন্য লম্বা waiting list আছে। নর নারায়ণের সেবা করার এর থেকে বড় নিদর্শন আর কি আছে ? দেশের ভক্তরা ছাড়াও বহু প্রবাসী শিখ আর্থিক সাহায্য করে এই মন্দিরের সব খরচ চালান। মন্দিরের কোথাও কেউ দর্শনার্থীদের থেকে টাকা চায় না। সবকিছু দানের উপর চলে।

আমার এই মন্দিরের যে বৈশিষ্ট্যটি সবচেয়ে ভাল লাগল তা হচ্ছে এখানকার বিনীত নম্রতা। শয়ে শয়ে ভক্তরা খালিপায়ে পুরো মন্দির ঝাঁট দিয়ে চলেছেন, বা রান্নার যোগাড় করছেন। পুরুষরা বিরাট হাঁড়িতে অগণ্য লোকের জন্য রান্না করে চলেছেন। মেয়েরা মাটিতে বসে তরকারী কাটছেন। একদল কর্মীরা স্তুপীকৃত ঝকঝকে স্টেনলেস স্টীলের থালাবাটি অতিথিদের ধরিয়ে দিচ্ছেন। আর একদল কর্মী খাবার ঘরের বাইরে হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে আছেন সবার হাত থেকে উচ্ছিষ্ট বাসন তুলে নেওয়ার জন্য। এত ঝকঝকে পরিস্কার মন্দির আমি দেশে আগে কখনও দেখি নি, বিশেষত যেখানে লক্ষ লক্ষ লোকের পায়ের চিহ্ন প্রতিদিন পড়ছে।

দুতিন ঘন্টা ধরে ঘোরার পরও এই মন্দির ছেড়ে আমার আসতে ইচ্ছে করছিল না। এই শান্তিময় পরিবেশে এক কোণায় দাঁড়িয়ে আমিও চোখ বুজে কিছুক্ষণ প্রার্থনা করলাম। এক অনাবিল প্রশান্তিতে আমার মন ভরে গেল। মনে হল আমি যেন ভগবানের আর একটু কাছে চলে এলাম।

Editorial

The First Flower

Every spring I look for the first flower. My search begins in March and sometimes lasts into April. By then the snow has melted off the lawns and the ice turned to puddles on the sidewalks. The sky remains gray with spring rainclouds but robins hop on the grass, hunting for earthworms after a storm. Iridescent black starlings sing in the trees. It is almost time for the first flower.

This year the first spring flower I saw was a white crocus, one of many like shining white pearls in a green lawn. Their small cup-shaped blossoms reached up, hopeful. Crocuses and snowdrops can survive the last fitful snowfalls in March or April in Chicago.

In spring I think of the things we wait for: new homes, new jobs and all the spring graduations. When I graduated from college at Seattle University, pink and white cherry blossoms bloomed all over campus. It felt triumphant for me and the flowers after months of term papers and final exams, of bare gray branches and spitting rain.

Spring is a season of hope for graduates. A degree can be completed in any month of the year, but most American colleges plan graduation ceremonies for May or June. The graduates in their shiny black robes and mortarboard hats pour out of assembly halls, as much a sign of spring as the crocuses or starlings.

Spring blooms with possibility and change that not only feels inevitable, but welcome and inspiring. We will find what we are seeking, sooner or later, maybe where we least expect it. Like the first flower of spring, it always arrives.

We hope you find inspiration here in the spring issue of Batayan.

Jill Charles
Chicago, USA

Two Rooms

Viola Lee

One opens
to a large cactus garden.
Lying on the bed,
you may encounter
some difficulties.
You may recall
a loss or possibly two.
Paint a picture,
It will not rain here.
If you need a break
there are ashtrays
in the cabinets.
Yes, the windows close.
There is also paint
in the closet.
If you need to wash up,
take a warm bath
in the eucalyptus Jacuzzi.
Of course, use it all,
There is more honey
in my room, which
is underground
near the cereal table.
The other room
is behind this one.
It is painted baby blue.
Yeah, it is quieter.
Some describe it
as an unusual tree.
If you get hungry
there is a kitchen.
There is also cake mix
in the towel closet,
next to the red paint.
I am sorry of course
the sea, both rooms
have fantastic views
of the sea. Take them both
if you would like.

Short Story

The Bee

Jill Charles

"The Bee is the first device of its kind ever made," Oliver told Sheila. "We produced only a hundred as samples but when it's released in August, it will take over the mobile phone market."

Sheila turned the gold and black computer phone over in her palm, then flipped it open to examine its keypad and screen. In its pouch, she found a tiny electronic pen and wireless earbuds. Slim, elegant and more addictive than cigarettes, she thought. The Bee hummed in her hand.

"It will hum like that when I call you," Oliver explained. "And if you oversleep or miss an appointment, the alarm will do this."

The Bee buzzed frantically until Sheila found the red stop button.

"That's not the best part," he went on. "If anyone tries to get into your Bee without the password, it will defend itself."

Oliver typed a code into the Bee and set it on the gray carpet beside Vita, Sheila's cat. The Bee buzzed and levitated off the rug. Vita tapped it tentatively with one brown paw.

In a bass voice, the Bee shouted "Stop, thief! Return me to Sheila Davenport! I am calling the police and emailing them your picture!"

Vita backed away as the Bee glared at her with its red screen and snapped her picture with a blinding flash of light.

Oliver laughed as the cat yowled and fled. He called out "Follow the thief!" and the Bee chased Vita around the room, buzzing and flashing red lights.

"Stop it!" Sheila screamed.

Oliver tapped out a code on his own Bee and Sheila's Bee quieted down and floated back toward them. It hovered above the table, blinking a white light at her.

"Hold your hand out," said Oliver. "It has memorized your fingerprints."

Sheila had produced and sold internet phones for eight years, even while she finished her double major in electrical engineering and business at Northwestern University. She had memorized every feature of every wireless phone, not only those she helped design at Telside, but also phones of every major competitor in the Americas, Europe and Asia. Although she worked on a prototype of the Bee, Telside guarded the final stages of its production closely. Now the finished product left her amazed and slightly intimidated.

The Bee woke her up each morning with her favorite songs and reminded her of each appointment and task all day, from staff meetings to her grocery list. As Sheila rode the Brown Line El train from her Lincoln Park condo to her fiftieth floor office in the Chicago Loop, the Bee spoke to her constantly. Emails appeared like white ghosts in one corner of its screen, and text messages and voicemails in the others. It reported on the local weather, traffic conditions, and exactly when the next El train would arrive. The Bee remembered her friends' birthdays and looked up recipes Sheila could prepare in fifteen minutes with only five ingredients, since work now left her too tired to turn on the oven.

News headlines scrolled across the bottom of the Bee's screen in blue and Sheila read the articles, no longer having time to read a newspaper, much less an entire book. She had the option of reading messages and typing responses or listening to messages through her earbuds and speaking a response. When Sheila clung to the handrail on the El or stretched in a yoga sun salutation, the Bee played relaxing music, sitar and steel drums. It memorized which songs Sheila played most often and her favorite web sites for stock prices, web comics and online games. The Bee let her know who was calling before she answered and its red Cyclops eye flashed when she missed a deadline.

Oliver called Sheila at all hours of the day and night, knowing that the Bee recorded his every word

even while she slept. He set daily deadlines for her and forwarded his electronic notes from all his meetings.

Sheila strove to be as efficient as her boss, to arrive at work earlier than Oliver, have her green tea and fruit and plug the Bee into her computer before he came in. Often he surprised her with lattes, invited her to the organic dell for wrap sandwiches or for drings after work. She found herself wearing gray and white suits because Oliver did, drinking espresso or sake because he did.

One night as they sat at the shiny zinc bar, Oliver said "Of course I'm too busy to date anyone seriously."

She rushed to add "Oh, me too."

"I think I'm married to my Bee," he joked, cradling it in his hand and beaming. "I spend more time with it than anyone. It wakes me up in the morning and sings me to sleep at night. The Bee knows more about my favorite music, movies and clothes than my own parents. No one loves you like your Bee."

"Except Vita," said Sheila.

"Who's Vita?" Oliver asked.

"My cat."

Oliver shook his head. "You should have gotten a purebred Persian like I suggested, not that thing from the no-kill shelter. You don't know where it's from or what diseases it has Breeding and brand that's everything."

"I am not a purebred," Sheila pointed out.

"But you are a Telside designer," said Oliver, his gray eyes shining like computer screens.

He reached out and squeezed her hand as it rested on the bar. Sheila felt a warm rush or flattery and longing, but also genuine surprise. She could not remember the last time another person touched her.

With the Bee, Sheila became an efficient, mania multi-tasker, answering email and text messages at all hours, long before and after work each day. She caught herself trying to return phone calls at hours when the recipients would be asleep. Luckily the Bee warned her what the time would be in any time zone she called. Sheila now trusted the Bee to count her steps with its pedometer and estimate the calories she burned on the treadmill and weight machine in the office gym. It checked the amount of vitamins, minerals, sugar and fat in all her meals. It could estimate the number of REM cycles in her sleep each night, but she never asked the Bee to number her forgotten dreams. Every day, she went to bed at midnight and woke up at five, maybe eight on weekends.

Because of all the protected information on her Bee, Sheila had to change her password often and use different passwords for each of the Bee's programs. After three months of this, Oliver found her handwritten list of passwords on a page of her address book. The tiny leather-bound book fell out of her purse onto the bar.

"I can't believe you're still writing on paper!" he snapped. "Any pickpocket could steal all your information and it would serve you right!"

He pushed his way through the crowd of suits and high heels, holding the address book too high for Sheila to retrieve it.

"Oliver, stop it! That's how I organize!"

"It's not organized!" he said, gutting all the pages from the cover and shoving them in the recycling tube.

Sheila screamed as she heard the tube such up her New Years' resolutions and quotes from the Dalai Lama, her best friends' home addresses and the tiny card inviting her home for her parents' thirty-fifth anniversary in Omaha. Because this information was personal, she never entered it into the Bee. Now she felt too exasperated to explain any of this to Oliver or even remember her password.

"I haven't written on a piece of paper in six months," Oliver boasted. "Not even on a sticky note, I threw them all off my desk the day I got my Bee. It's much more environmentally correct."

Sheila grabbed Oliver by the lapels and hissed into his face "You have no right to steal from me! My life was in that notebook!"

She dashed out the side door of the bar and flung herself in front or a cab. The started cab driver asked for directions to her home and without thinking, she snapped "Just look it up online!"

The white-haired man chuckled and said "Ma'am, if I could afford one of those computer phones, I'd be retired instead of driving this bucket of bolts." He unfolded a street map and traced his route before turning on the meter and driving.

At home, Sheila went straight to bed, silencing the Bee and snapping it shut without checking her messages. She didn't want to read Oliver's explanations, excuses or watered-down apologies. Deciding to reset the password tomorrow, she shoved the Bee in the back of her underwear drawer.

Vita woke Sheila up in the morning, purring beside her head and tapping her nose with one brown tabby paw. Sheila stroked Vita and scratched under her chin until the cat closed her lime green eyes.

"I've neglected everyone and everything in my life but Oliver and that stupid Bee," Sheila said. "I can't remember the last time I saw my friends or called Mom and Dad. I was so stupid to get involved with a co-worker, let alone my idiot supervisor. Not that we ever actually went on a date or anything."

Sheila sat up and Vita raced to the kitchen. For the first time in months, Sheila fixed a real breakfast: green tea, old-fashioned cat meal with bananas and Greek yogurt with honey for herself, milk and organic canned salmon topped with three shrimp for Vita. It was 6:03; she had plenty of time to get ready for work.

She dreaded resetting the Bee's password and put it off, doing twenty minutes of yoga, showering and dressing in a comfortable yellow sundress and sandals. Finally she opened her drawer to face the Bee.

The Bee buzzed, flashed its red light and flew past the side of her head, whizzing through her hair, shouting "Stop, thief! Return me to Sheila Davenport!"

"I am Sheila Davenport! Come back! Look at my fingerprints!"

She chased the Bee into the living room, waving her hands like a lunatic. It turned toward her, hovered and flashed its red eye. Oliver had warned her that an alarm would go off if the Bee went to long without a password reset, but as he had explained that, she had stared at his thick black hair and gray eyes, completely forgetting the directions for disabling the alarm.

Sheila held out her hand and slowly repeated her last password.

The Bee threatened "Stop thief! I am calling 911 and emailing your picture to the police."

Not about to be framed for theft by a defective call phone, Sheila reached out to grab the Bee in mid-air. It buzzed and slung her palm with its red laser. Sheila covered her injured hand and the Bee kept firing, one hot red flash stinging her cheek. It would aim for her eyes soon, so she risked both hands to catch it, then shoved the buzzing, burning Bee into a pillow and wrapped it up.

If she could get it to water before it burned the pillow, she had a chance. Sheila prayed that the Bee was not totally waterproof as Oliver had claimed. As she pressed both ends of the pillow, it began to smoke. She rushed toward the bathroom and got halfway down the hall before the Bee flew out of the pillow.

Terrified, Sheila dove to the floor and covered her head as the Bee swooped down. She heard hissing and clicking, then one long buzz that slowly faded out. She looked up to see Vita ripping the Bee open with her claws. Sheila snatched Vita out of the wreckage of microchips and plastic.

"Don't eat it, Vita. It's poison," she said.

Vita's whiskers were scorched and she licked one singed paw. Sheila sat up, crying and catching her breath as she held her cat in her arms. She felt the small wild heart beating against her heart.

Poem

Supernatural

Tinamaria Penn

A red lip gypsy I've been named
As a discovery of my hidden culture
Dressing in turbans not of my own
Living in makeshift tents
Foretelling outcomes of others
Never revealing my own
Like a slickers sleight of hand
Until I am caught

Paper crystal ball crumbles
What was I supposed to do?
Reach for the tarrot cards and begin a new fortune
Or continue on in the same story
Like the game was never up
Revealing the truth
Altering destiny

Wondering is there any real recovery
In this slow dance of discovery
Sheltered by a spoiled cocoon
Disguised as a covered wagon
Filled with tonics and potions
Something new and yet borrowed
From yesterday's treasure

Resting upon a enchanted listener's dream
In a curious mystery realm
Conclusions unwrap like a scarf
My tainted supernatural power
Motions unwanted reality
Through a poisonous smile
That never meant any harm

My Spoon

(Inspired by Mayi Ojisua)

Tinamaria Penn

I must carry my spoon in my pocket
As I wander
From village to village
My family takes it for granted that where I am there are spoons
But I know better
I have learned from my past travel to my friends
That they eat with their hands
But not me

I show off
I have my very own spoon
To carry to wherever I will go
Eat what I want and how I want to eat with a spoon
My spoon
I announce one day that
I will carry my spoon to America
They laugh at me
and
I laugh too
Knowing that they do not know my density

Now I sit
At America's table
Where the table is completely set
So it seems
But, I still carry my own spoon
Because there is something that is missing
Something that this great America seems not to see
There is no spoon
No spoon offered
Not even to the hands of my childhood friends
Who may never eat with a spoon

Short Story

Uma'r Maya

Priya Chakraborty

As Maya sat on her white sheeted bed indulging in her newly found love for tea she remembered having a conversation amongst her friends, about home and finding it. It never stopped to amaze her that how every human being around, is silently in a never ending chase of finding resort. Sometimes in a country, sometimes in a place, may be a patch of land and more often than not in another person. What that conversation did that day was, it triggered Maya to think what home was to her.

Not that she hadn't thought about it before, but sometimes like anybody else you need to justify yourself with a legit reason to dig into yourself and question yourself. It can be a very scary thought. Looking up at the ceiling she noticed the white lamp growing dim on her. Maybe it is to let it go and bring home a new one or was it just in her head. May be not. But back home in the same centre space of the ceilings used to hang a four bladed dusty old black fan. Not a very common concept in this part of the world she now lives in. Leaning over her red and white stripped pillow, she gazed out at the obnoxiously silent night sky outside.

The sky was void of clouds and the stars shone like they were celebrating Maya's melancholy. A gust of wind played around with her unruly limp hair. But back home the night skies are foggy and stars don't dazzle like this but it gave her shelter. The gust of wind so clean, but back home it carried a smell. It smelt of dust and the hustle and bustle of pitch roads. It smelt of the fisherman enjoying his late night cigarette under his sweat filled moustache. It brought in the neighbour's joy of cooking dinner for her in laws, hawkers shutting down their trolleys with anticipation filled gusto. The wives and children waiting at home. A middle class gentleman in his grey almost turned black trousers and a half checkered shirt riding a decade old scooter like a chariot with a bunch of balloons in his hand. A young girl in a noisy auto, peeping out, staring at the orange and yellow lamp posts. They glow, like a halo in a cloud of dust.

"Maya, dinner's ready."

She startled out of her bed by the abrupt collision into her daze. She turned around to see Uma smiling at her with a plate in her hand. The white apron on Uma now ad an abstract yellow and red art on it. Turmeric and tomato. Maybe paprika too.

"What have you got?" Maya managed to speak.

"What have I got? What do you think woman? *Maacer jhol bhaat, kano khabi na*?" Uma giggled caressing Maya's jet black hair.

"*Khabo. Cha ta khub bhalo chilo*." Maya said, with a glorious smile on her face

"This is even better. Come out now." Uma said, walking out of the door.

"Aschi."

Maya started removing her blankets to get out of her comfortable bed and as she did, she smiled to herself.

Must have found home.

Uma.

A play in one Act

Stolen

Abhijit Mukherjee

(Living room of a middle class household; a wall cupboard, a sofa, a telephone, a television; one can see darkness of night through an open window. Dogs barking can be heard. A figure with a tight dark body suit appears outside the window. With a portable gas cutter the bars of the window are cut. The figure jumps into the room. At that moment the telephone rings. The figure hesitatingly lifts the telephone.)

Hallo

(The other half of the stage lights up; a lady in her late twenties sitted at the office desk. A US flag is hanging on the wall. Her eyes are fixed on the computer screen. She is making a phone call.)

Hallo, Hallo

(After a long silence) Yes,

Is this 25105502?

(Hesitatingly), I think so.

What do you mean, "I think so"? Is it the residence of Mr. Raman Kapoor?

Maybe, I mean yes…..

Who are you?

I, I am like a guest.

Guest, but you don't know the name of the host!

Where are you speaking from?

Chicago!

Chicago! (visibly relieved) That's some distance from here. I can tell you the truth. You won't be able to harm me!

What nonsense are you talking! Are you OK?

Ya Ya!, I am not mad, in fact, I am a burglar.

Burglar!!! You a burglar! Oh my God there is a burglar in the house! Mummy, Papa!

Are you hearing the word for the first time? Why are you so excited?

You must be kidding?

No lady no; just as I jumped into the room after breaking in through the window your telephone rang. Just imagine how difficult it can be if the telephone rings when you are so busy with crucial work. It was my presence of mind that I quickly lifted the phone.

Oh my God! Oh my God, a burglar in the house, 'I am so nervous'!

Nervous; you? I should feel nervous.

Are you carrying arms? Pistol, revolver or chopper?

No! I don't carry arms. That's not my method. If you keep them, you may like to use them too: I avoid them. The number on my screen is our house's. Can you tell me the house number please? Is this 74/9?

You are asking me difficult questions. Haven't checked the number before coming in.

Have you seen the name plate at the door? Raman Kapoor, my father.

Huh, do you think I came through the main door and your father welcomed me to the drawing room? I had to remove the iron grill from the back window to come in.

Shall I make you a request? Please!

You need not be so apologetic. Come on.

When you have broken in you must take something. I can't stop you. Please don't harm my parents. I have a small sister too, please, please do not hit them. You may take whatever you like.

But in case they wake up I must save myself. Don't you think I have a right to live?

Of course, of course you have.

Then, how can I promise you?

OK. We shall keep the line on? Just in case they wake up please let me talk to them.

That's not a bad proposition at all! Hope there is not a big brother of yours or some stupid servant or a dog!

No, no one else. We are just two sisters.

Hmm a small family.

Do you have a large family?

No family at all.

Spouse or children?

Don't have enough to feed myself. Marriage is a far cry.

That's right. In our country there are unfed millions.

Madam do you feel hunger? You are in a country where people are sick due to overeating.

You're right. Obesity is the biggest problem here. Lot of junk food!

Hot dogs, hamburgers, pizzas, cola……..

Seems you are well informed.

Everyone knows about all these things. Are you studying or in a job?

Both, doing masters in IT part time, also working.

Very good, this is age of information.

Strange, you really know a lot!

At least I read the newspaper everyday. Do you think all thieves are illiterate?

No, no, I didn't want to call you illiterate. After talking to you I feel you are not like other thieves.

How many thieves do you know?

I don't know any other, but telling from my impression.

Did you dig a hole on the wall?

These are modern days. Now you do not have the time for making a hole through the wall. Just use a gas cutter.

Right! I Am sorry to say we do not keep cash at home, gold is in a bank locker.

This is very unfair! Do you know ornaments are disappearing from bank lockers? Do you think that banks would pay you if ornaments vanish? They don't guarantee anything.

You're right. But my parents have great faith in banks. But I'll not let you go empty handed. I know where the cash lies. In the kitchen there is a big tin of biscuits. There is dal inside. Inside the dal there must be some cash.

How much? 20-30?

More, could be about hundred.

I don't touch small change.

Do you have a flash light?

Yes, but we thieves do not use it normally.

In the bedroom there is an almirah, on the lower shelf there are albums. In the green album there must be at least thousand rupees.

That's not enough. Don't you have some other valuables? When I broke in I thought such a large house must have a lot of expensive stuff.

Yes there is, by the side of the almirah there is a cabinet. There is a camera, a handycam and a portable DVD player.

They have no resale value. There is excess production all over the world. The prices are dropping faster than the monsoon rain.

Really, you know a lot.

Who else would keep a tab on secondhand market?

What's the time now there?

2.05, you are eleven and a half hours behind, that means 3.35 in the afternoon. Saturday.

My God, you know the local time of Chicago!

Why? Is it very difficult to know?

No, not difficult, but, what's your target?

Nothing particular, but I'm not a petty thief that I'll go away with whatever crumbs you throw at me. Do you have some antiques?

Antiques no, at least I don't know, but there were in our house in Lahore, British dolls, German watches, French cutleries.

Are you from Lahore?

Yes.

We too. But not from the city, a village about 50 miles away.

How nice!

There is nothing very nice. We were a poor family there too. But you seem to be from an aristocratic family.

Not very rich though; we had a few shops and businesses. We lost all that in partition.

Have you ever been there?

No, my father was not even born then.

How old is he?

57, why?

My father would have been 55 by now.

Is he no more?

No, he was a school teacher.

How come you are in this field?

Why? Is this field bad?

No, but burglary, is that good?

In a country where two out of three citizens are thieves what better profession than this? My father was a village school teacher. No second income, no tuition. So he had to die early, half fed.

Is your condition better than your father?

Not bad, I have a motor bike, mobile phone, flat TV, microwave. Have a cook. I pay the EMI of my flat in Mohali.

You're kidding. You are really established and educated too!

What I know can't be called education.

You have put me in a great dilemma. Can't believe that you have broken into our house.

This is the age of show. People with the gift of the gab are worshiped. Don't be impressed with my words. I am really a thief.

That's the strange thing. You seem to be a thief with a class. I wonder if we have anything worthy of you in our house!

Yes, there is, I have not come without any information.

What's that?

A Rolex watch, 1818 or 19 make, round 2" diameter, winding watch.

You're right! That belonged to my great grandfather. My father winds it everyday. Strangely it still runs. How did you come to know?

I have a network.

Wow, you are very organized!

How else shall I operate in this age? Your father had posted the information in a blog. I hit upon that in Google search.

That means you already know our address from the internet. Why did you say that you don't know the house number?

Just to be a little cautious.

Will the watch do for you now?

For the time being, yes. That should fetch me 5 to 7 lacs.

You must be kidding, who'll pay that much for an old watch?

Collectors, even the company sends its agents for collection.

Still you do not call yourself educated! Surfing the net you are aware of what's going on in the entire world!

No, what's the use of the world for me? I only know what is necessary for my work.

So, you have a computer too?

Yes, an assembled one.

Laptop?

No, but shall buy one if I get the watch.

Papa lives in the room in the South. In the desk there is a top drawer. You should find it on the right side.

That's like a good girl!

But the gate at the staircase is locked!

You live in the USA. How long do the blacks take to open the boot of a car?

My God! Did you come to the US as well?

You need not know that.

My father's sleep is very light. In the slightest of noise he wakes up. Please give the phone to him just in case.

Yes, I'll.

Please do not spray sedatives. Papa has a pacemaker.

You love your dad a lot. Don't you ?

Very much!

Good; please maintain this lovely relation, with your dad, your mom. Does your father have any arms?

Yes.

He has! Why didn't you tell me so long ago?

Don't worry his pistol is inside the almirah, unloaded.

Then what's the point in having one?

Mama said, "Either I or your gun will be in bed."

That's good; no dogs either!

There was a Doberman. My favourite, when he died I cried a lot. Then I came here. My parents never took the trouble of keeping another dog.

Very nice! Now I can go safely in, but there is a sound from toilet. Someone is there.

Now what!

Don't worry. I must be patient. Old men take a long time to go back to sleep.

But my father takes tranquilizer everyday. May be he will fall asleep early.

That's not good. He'll grow drug dependance. Later there may be withdrawal syndrome.

What should he do?

Work out, that's the best medicine.

Because of his heart condition he can't workout much.

With modern pacemakers that's not a problem at all….

(An American man appears in the lighted half)

Hi sweetheart care for a coffee?

Thanks Bob! I guess not!

Did you talk to another guy there? Did he call you sweetheart?

Yes peak hour, my one hand is on the phone, the other holding the mouse.

I should not disturb you.

No, no, the work goes on systematically. Does not require a great attention.

Did he call you sweetheart? Is he really so?

You are crazy. He is fat in body and head. It is common to call everyone sweetheart.

Don't you have a boyfriend there?

No way, I need an Indian husband; else how shall I enjoy Bollywood flicks with chilly chatpata? What about you?

No, I proceeded some distance, but it was not successful.

Sad. If you don't mind, what happened?

Just a minute, the bathroom light is still on.

Papa has a little problem of prostate. By the time you finish your story he will be done.

Nothing new, all love stories are the same. But we really had no love story here. One way traffic. I am not at all attractive.

How do you know?

I am a bit too tall, rough face and muscular body. I neither sing nor dance. In company of men I always feel their repulsion.

Ok will you now stop your self criticism and tell the story!

I just gave the background, you'll understand better now. I was coming back from Delhi by train. That boy was traveling with his parents. There was some kind of shy charm in him. He was neither big nor handsome, but a reserved shyness fascinated me. When they heard that I was coming back from a long trek in the mountains the father was very impressed. He had gone to the Himalayas before marriage. Never got a chance in the last 25 years. We struck a conversation but the boy refused to turn his face from the window. I may be ugly

but I am a girl too! Should he not look at me at least once? The mother was also very reserved. While describing the rugged beauty of the Himalayas to his father I was internally being smitten by a cute boy of small stature who was so far away from the rough and tough ways of mine. When the father offered me a rasgulla the mother's scornful look forced me to refuse it. Ah! Rasgullas my favorite!

You said it! Rasgullas; how long have I not tasted a genuinely good one. Here you get the stale tinned ones that taste like cotton balls.

That's the biggest difficulty of staying abroad, food!

Let me bear that pain of American food. Please continue with your story! What's his name?

Somu from Soumya; suits the goody goody look of his.

Your combination is very interesting.

Combination! With my rough and tough look he was not ready to even turn his gaze back from the window. But an incident turned the tide…..

Incident! Must be sweet!

Could be sweet, but… Somu had the ticket with him. After showing it to the checker he had folded it and put with the rubber band of the sweet box. After some time he found the box empty and threw it out of the window. The train had just started pulling out of a small station. He cried, "My God! I just threw out the ticket!" Everyone was startled and started yelling. I jumped out of the moving train and ran along the track! I found the sweet box and picked up the ticket. My rock climbing experience came to my help; then jumped into the moving train.

So you became an instant heroine! Sorry hero!

Not that much, but the mother offered the entire stock of rasgullas with a grateful gaze. Somu also mumbled some appreciations, I couldn't hear. Finally, I had become friendly with all of them. They even invited me to their home.

Did you go?

What else could I do! I could never forget the cute innocent face of Somu. Usually acquaintances of trains end at the end of the journey but in this case I just could not come out of this. But I didn't go on the next day. After a few days, I went in an afternoon. They were very cordial. Somu was away in University. He is doing his PhD. I understood that he'll not be able to earn enough to maintain a family for another couple of years. That made me even more attracted to him.

What were you then?

No, certainly not a burglar; tried my hand at a business; in partnership, my labor and partner's capital. A local spice grinder said he is ready to invest money if I supply ground spices to hotels and restaurants. They trust a lady supplier more.

Did it do well?

Yes, within a couple of years I could earn a few lacs a year. Employed a few more agents.

And Somu?

Just a sec; the bath light is off. Now a few more minutes for your old man to sleep.

About ten minutes. Otherwise I am there. But it's not good to have a noisy scene at this hour. We have night guards in our society. But you must finish the story.

Yes, I knew, I could see that in normal course a relationship between us was not possible. Took the extreme step. Bumped into him on the way to university. Boldly asked him to come with me to a café. He agreed.

Wow! Slowly slowly, then!

Do you think it was romantic? As soon as we had ordered coffee he said he understands why I roam around their house but our types do not match! He wants to go to the US after his PhD. I am definitely not the ticket to the States.

So heartless!

I closed down my business and went back to the Himalayas.

Himalayas!

Yes, I thought I must do something dangerous to hold my mind. Roamed around for a couple of months. Then I decided, I must do something big, big money, big bang, big risks. I started my present work.

What?

Antiques. I collect antiques for the dealers. Most

dealers sell fakes. But there are originals too. A woman has special advantages. People tend to trust her more. Had trouble with people too. Once a Parsee old man had shot me with the gun I was looking for!

My God!

I didn't go to steal! Wanted to strike a deal. The crazy fool got so irritated that when I offered a lower price he lost his control. But every profession has its dangers.

Very interesting! So you steal antics.

Not really. I buy most articles at a price. But this is a market where no one knows the right price. Sometimes owners ask for exorbitant price or do not budge at all. Then I have to work harder.

Stealing!

Yes.

But you are no ordinary thief!

Who said that? I am totally devoid of conscience. Like all other thieves, right from petty pickpockets to the highest officials. But I am choosy. My target is only antics; I steal only if negotiations fail. But I'm no great soul.

Did you have a negotiation with Papa?

Yes, I called him on phone. He demands nothing less than seven lacs but its market price is not more than five. He is not at fault. For collectors like him it is not easy to know the right price.

But was Somu put to rest?

No, he is still in my heart. When I stand in front of the mirror from my back a cute innocent face flashes by. But I haven't tried to keep any relationship with him. He may be married now working somewhere in the States; like you.

Didn't you try to find out? Why don't you call once!

Why should I? This is the best thing about one way love… no expectations, no betrayal, no heartbreak. No demands but he becomes captive in you. He speaks whatever I want him to speak. He does whatever I ask him to do.

Shall I say something?

Quickly; I have very little time left.

Please wait! How much can you pay for the watch?

I asked for four lacs.

If I make him agree at that price?

Why? Are you afraid that I'll hit him?

Can't say no! If you steal you'll get it free.

I am not interested in stealing. But I've very little time. The customer has to catch his flight back in two days. If you assure…

If you call tomorrow at ten you'll find that everything has been taken care of.

Is it a promise?

Promise.

Well I bow to your love to your father. Keep it up. Very soon there will be light. I've to get down by the pipe.

Please wait! I have something to say.

What?

About Somu!

I've told you everything.

Yes, you have. I too have to say something.

Strange! What do you know about Somu?

Some strange things do happen. That's why life is not so uninteresting.

OK.

Somu of Greater Kailash!

Yes.

Age 27-28.

I guess so.

If I'm not wrong his father is S N Sarkar.

You have really surprised me. Do you know him?

You're right. Somu is cute, gentle, reserved.

No oversmart antiques. Sweet dimples!

And the eyes like two little lotus ponds. The nose a little curled and cleft but so untouched!

My God! You're in love with him!

So what!

You are a far better match. In fact you should marry him. My best wishes!

Will you leave your claim so easily!

Claim! What claim do I have? I am a nonentity. I have him in my mind. His image keeps me company. That's all. I am happy, very happy.

I really like you. You are a very loving, caring person.

You are also very kind hearted. Not like me, rough and tough. You'll be an ideal match for Somu.

Genetics don't say so. They say opposites are a better match.

Life is not science. Do you think kings should marry beggars? Please marry him. His ambitions will be fulfilled. He'll be very happy.

And you?

I too will be very happy. Such a simple lad needs a caring partner. I'll be very happy.

But Somu won't.

How do you say so?

From experience.

What?

I met him. In fact, our families arranged a meeting when I visited India last July. We were supposed to be married in December.

What went wrong?

I was sold at first sight.

Quite understandably!

But I could sense that something was wrong when we met at a restaurant.

Who's the culprit?

Subha Sehgal! Do you know her?

I don't.

Did I hear you sigh? Please don't get me wrong. I won't inform the police.

How are you sure that I am Subha?

Somu. He confessed to me that he met someone a little too boyish, very courageous, in a train. She loves to roam around the mountains. He was desperate to build a career in the States. After a few trips to the US in conferences he is not so keen. He has taken up a research position at a Lab in Delhi. He hopes to meet Subha someday. He has kept the train ticket with him neatly folded up in his purse.

Stupid, simply stupid!

Who?

Soumya, he should simply get married to you. Instead he is after this ugly duckling Subha! Such men have very little willpower. Just get him to States and you'll find he is totally committed to you.

Yes, his parents were very interested. I was also tempted, but the look in his eyes while staring at the ticket!

Aren't you getting too sentimental!

Aren't you? Why don't you go back and ask him what he wants?

On what strength? I am not beautiful, nor do I have money. Please save Soumya from the she devil Subha?

His last mail came today. He has written, “I don't know how long, but I love to wait for Subha.”

Please don't waste your time in such sentimental trash! I must escape its already light outside. Please save Somu!

He has his savior near by. Why should I?

You're right! I must see this tomboy Subha.

Please promise!

What?

You'll make Subha agree!

Ok, but I must get the watch.

That's a deal! Four lacs cash. Yes just one sec. I brought a laptop to India for Dad. He has no use of it. He'll give it to you along with the watch.

For what?

The wedding gift for Subha and Soumya!

(The rights of reproduction and staging of this play in any language is reserved by the author)

Sikkim

Shravani Datta

The Indigo Flight took off from Kolkata Airport at 10:30 AM and touched down in Bagdogra after 70 minutes. Baggage cleared without any hindrance and the five of us stepped out to the parking lot to locate our cab driver. He had come to fetch us from our Gangtok hotel, Nor Khill. It was midday already and the outside air was oppressive and sultry. The horns blared till it gasped into cooler quarters. I did not want to stop, but had to for a quick lunch at a local highway restaurant.

Sevak Road, the artery from Siliguri to Gangtok is joined by the Teesta River which ultimately drains in Bhutan. Notable here is the imposing Coronation Bridge, named for the coronation of King George VI and Queen Elizabeth. From here, the Teesta twitches past entrancing villages' aplomb with oodles of charm. Congregations of locals buzzing between main street stores and restaurants appear as we inch closer to Gangtok.

After 5 hours, a little after sundown, our 4 by 4 halted in front of the hotel, Elgin Nor Khill. Set amidst the curated lawns, overlooking the Paljore Stadium, this hotel is a former royal guesthouse. The lobby boasts of an amazing collection of thangkas and paintings, a legacy of the royal family!

Only ten minutes by foot, The MG Road or Mall Road is the shopping area. This swarming market place swanks Golden Tips, a tea lover's paradise. From Mango tea to masala tea, Old Indian tea, white tea and multiple selections of Assam and Darjeeling push you back by 2 hours, to say the least! The manager lays out a tea table that can please royalty and you get to taste and pick! I came out heavier by a couple kilos!!

It was not until dinner in the ceremonial dining hall of NorKhill, that we got our passes for East Sikkim.

The next day was crystal clear and I woke up to an armchair visit of Kanchejungha from the bedroom. Delayed by its magnetic allure, I had to gobble breakfast in haste to hit the road for the day trip on time.

It was a cold day in May and the ascent to Nathula at 14800 feet was not going to be easy. Our four wheeler proceeded first for Tsanghu Lake at 12100 feet.

Thegu village

Sudden cloud cover on Tsanghu Lake

A sudden cloud cover marred my vision, yet the blurred lake water was grey white, unblemished enough to hold my gaze forever.

Yaks flank the area around the lake and curious travelers mount their not so light bodies on the turgid animal- all ever happy to click photographs!

On the way to Nathula, travelers change shoes and slip into boots in the town, Thegu. The highest ATM in India is also situated here.

Further east from Thegu, the drive continues toward Nathula Pass. Finally at 14,140 feet, Nathula

looked pretty much like a Chicago backyard after a heavy blizzard. I was already lightheaded from lack of oxygen and a trifle wind swept with drafts of snow to haze and distort my steps.

The silk route operated through Nathula, till 1962. Once the trade route between India and Tibet, today the lofty pass stands with Chinese and Indian soldiers guarding their border. A stairway leads to the border where The Nehru Stone, marks the visit of the former PM of India. (No photographs allowed)

There is so much of kindness and hospitality in the people of Sikkim. The Lepchas, Bhutiyas and Sherpas intermingle and I cannot tell the difference. It does not matter: what stays is the balmy welcome of a hot cup of tea or Wai Wai noodles to a tired sightseer! We head back to Tibet Hotel for late afternoon lunch on momos and thupka.

Still heavy with lunch our troop strolled in to Baker's Café on Mall Road. The sun was down and we could not get the valley side view, but gorged on the sinful apple crumble, lava muffin and hot chocolate.

The North Sikkim passes, granted for 4 days had arrived. It is only open for tourists from May to September.

It took us half hour to get out of Gangtok. On our way, we stopped at the Directorate of Handicrafts and Handlooms, which is the state run emporium of handicrafts. This had an array of colorful carpets, masks, lacquered tables called choksis and handmade paper. Our Bolero, zipped through Ganesh Tok, Hanuman Tok but could not do the ropeway, it was closed following the ripple effect of earthquakes in Nepal.

The car crawled through Gangtok traffic passing suburb of Deorali and stopped at the Rumtek Monastery, which is undoubtedly the largest monastery in Sikkim. Built by the fourth Chogyal, It had to be rebuilt after being wrecked by an earthquake. This is also the home of Kargyupa sect of Tibetan Buddhism and a seat of Buddhist learning or Dharma Chakra Center. At least 500 monks at a time engage in picking up skills to propagate the tenets of Buddhism.

When our vehicle finally hit the North Sikkim Highway, it was past noon and time for lunch. We kept moving along the road for 38 kilometers, and gradually lunged in to the Phodong Monastery. This Kargyupa Gompa, originally built in 18th century was recently rebuilt but the original frescoes and paintings were

(Rumtek Monastery)

preserved. Significant among these is the striking fresco, Bhava chakra, or the wheel of life. This is one of the basic expositions of the fundamental law of Buddhism; man is entrapped in the recurring cycles of rebirth and their attendant suffering.

The wheel is a large disc held in the clutches of a monster, his head overtopping the whole. He symbolizes the human desire to cling to worldly existence. The wheel is divided into compartments representing the various worlds; the hells, the heavens, and the linked chain of the causes of rebirth. At the center are the three original sins of lust, anger and stupidity.

After a brisk feed on sandwiches carefully packed from Nor Khill, we pressed on, trying to make the most

of daylight for the onward journey to North Sikkim. The first village to pass was the sleepy Mangan : that overlooks the Teesta and the Lepcha reserve of Dzongu. The road from Mangan to Chungthang traces the Teesta going through thick forest.

Burbling mountain streams are constant companions till you come to Chumthang, at 5740 feet, projectedand embellished in the confluence of Lachen and Lachung rivers.

Just outside Chumgthang, the road bifurcates. Taking the left road we moved towards Lachung. The two valleys of Lachen and Lachung run northward to the Himalayas which divide Sikkim from Tibet. The journey is a feast for tired eyes and a dreary soul. Almost at every twist up the mountain you would come across a mountain torrent cascading down the hill slope or a sparkling waterfall gleaming against the deep green of the forest.

We were welcome in the Yarlam Resort, with traditional khhaada and tea. Each room in the resort was infused witha quiet composure that reflected the gravitas of the surrounding snowcapped peaks.

The following day started with a visit to the Singba Rhododendron sanctuary which is the reserve beyond the frontier village of Lachung en route Yumthang valley. Sir JD Hooker, the famous botanist who traveled through Sikkim in 1850 writes" the banks of rivers between 8000 feet to 12000 feet in altitude are covered by rhododendrons, sometimes to the exclusion of near wooded vegetation. "There are 40 species to be found in Sikkim.

The tree line in Sikkim continues to 14,700 feet, so Yumthang Valley at 11,800 feet is surrounded by an alpine forest and white slush topped mountain. It exudes irresistible charm when primulas and rhododendrons carpet the valley floor. Yumesamdong or (Zero point), about 24km from the valley brims plentiful with the fragrance of the azellia, a plant collected by the locals as incense.

The trail back to Chumthang is equally beautiful. Our driver now shoots straight for the right bifurcation for the uphill ride to Apple Orchard Resort in Lachen.

Lachen, meaning the Big Pass, is home to the Lachenpas belonging to the Bhutia community of Sikkim. The predecessors of the present day inhabitants built the hamlet along the verdant slopes set in resplendence against a backdrop of commanding snow coated peaks, glaciers and rock cliffs.

(Yumthang Valley in bloom)

At an altitude of 8838 feet, Lachenhas only about 200 homes and is one of the 31 sites handpicked by UNDP (United Nations Development Program) for stimulating village tourism. It is Sikkim's most scenic village effortlessly outdoing nearby Rabom, Chaten, Talem, Yakthang, Samdong and Thangu.

(View of Lachen)

The following two days were spent exploring the Chopta valley and taking the road to Gurudongmar Lake.

Light mountain drizzle with occasional thunder spotted the evening. We were jittery and nervous about the morning weather and trip to Gurudongmar.

It cleared a bit in the wee hours and our driver was ready to accelerate at 3:30 AM. Though May, it was cold and the plan was to reach the lake by 8 AM. Our idea was to stroll for 20 minutes and leave by 8:30 AM. The last wheel out of the lake area is around 10 AM.

Just 20 minutes' drive from Thangu the last village stands the Chopta Valley at 14,000 feet. The distance between Lachen to Thangu is 30 kilometers but takes close to 3 hours. The road is rough, uncomfortable and jerky, but the terrain is beautiful and you rise close to 4500 feet in this short span. The green vegetation of the lower heights soon transforms to Alpine terrain with canonical trees. Once, above tree line, there are only

Tibetan Plateau areaapproaching Gurudongmar Lake

Gurudongmar Lake, pristine and placid at 17800 feet

bushes that bleak in to vast lands of the Tibetan Plateau. An hour from Thangu is the Army check post, the last stop before the one hour drive up to Gurudongmar Lake.

Beyond Thangu, our army men skirt the road with tanks and other fire power. As the road steers to Gurudongmar Lake; the landscape becomes more barren. This is a cold desert.

In these seven days , sometimes lack of oxygen or a casual storm, dangerous roads and fluctuating weather drew my attention close to the comforts I am used to. I would ask why I preferred a vacation that came with a docket for physical hardship?

As I walked away from this awe inspiring creation hoping to behold this splash of calm splendor in my inward eye forever, I could only appreciate the bounty of nature and the mesmerising gems it handed out with every height I scaled !

I realized how important the summits were, but even more rewarding was getting there! Truly, the journey shapes the destination.

The Evening Sun

Photo of Chicago Harbour by Tinamaria Penn

Amazing Art of Dokra

Bishakha Dutta

My tryst with dokra was facilitated by Shantiniketan and the haat of Sonajhuri. I was then a student of Viswa Bharati University. The idea of having our evening adda at the Sonajhuri Haat suddenly dawned on me one afternoon. Excited by the prospect of a unique experience, I rallied everyone to join in. Convincing others didn't strain much of my energy or test my skills. We treaded down the red-earthed thoroughfare, crossed by green rice fields, overcame the wax and wane of Khoai to reach the haat venue. As we inched closer to destination, we could faintly hear renditions of baul singers and the mellifluous sound of their dotaras. Decibels rose as we neared the haat and soon we were there!

In the midst of the Sonajhuri forest, the haat is an eclectic mix of colour, celebration, creation and divinity. Sellers with their neatly displayed handicraft wares, buyers in myriad moods and outfits and bauls singing the path to the divine. In spite of it all, a particular style of craft grabbed by mind and attention. A piece of craft I had not seen before. To me, it looked strange in form and substance. It didn't mirror any known god or goddess. It didn't resemble any animal, nor any spear-holding tribal warrior. It was unlike anything I had seen before. The material used was not clay nor was it shining brass. I was intrigued. What did the art depict and what was it made of? Not inclined to

make public display of my ignorance, discreetly I asked my friends if they knew anything about the figurines.

"It is called dokra art." I turned around and faced a slightly built, dark complexioned, pan chewing man responding to the novice query.

"Dokra?" I had not heard about it before. "How much are they priced?" I inquired.

"That varies itemwise, madam. Some cost Rs. 200 while some are for Rs. 300. And that Durga motif you see, we sell them for Rs. 3000," the man replied.

Astonished, I asked him why dokra work is so costly.

"These are made from brass, madam," he explained.

"But why aren't they sparkling?"

The man smiled in response.

Having discovered something new, I felt a thrill surge within me. I was feeling inquisitive to know and learn more about this form. I asked him about the place where dokra is cradled.

"Dariyapur," he informed. He offered to take me to the village and show me how the figurines are made. Out

of sheer curiosity, I consented. We decided to start our journey from Bolpur station a couple of days later.

I reached the station at the designated hour. The winter chill was still palpable in the morning air. My guide, named Ratan Mondal, kept to his punctuality. He showed up within moments of my reaching it. As I boarded the train, my elation was overwhelming. Having crossed Bolpur and Bhediya, the train sped past lush green rice fields and stretches of red soil in between. We disembarked at Guskara station and got onto a bus that would ferry us to Dariyapur.

While consenting to and subsequently undertaking the journey, I did not comprehend the magnitude of learning awaiting me. On reaching Dariyapur, I gathered that the place is locally known as 'Dokra Haat.' Producing dokra work must be the traditional profession here. The entire village must be involved in this work, I contemplated to myself. All the houses looked similar with thatched roofs and mud walls. Clay mounds, of different shapes and sizes, lay all around to dry in the sun.

My guide introduced me to Paran Karmakar, a dokra artisan. Probably sensing my eagerness to know about the form, he took pains to explain the several stages involved in production of the figurines that I was enchanted by at the Sonajhuri Haat. Preparing wax for the mold is the first step of the elaborate process. For benefit of readers, it is relevant to state that molds can be made from either wax or a mixture of resin and asphalt.

To start with, several ingredients are mixed with hot, molten wax which is subsequently strained into a large vessel. Once the wax cools and hardens, artisans use it to make molds of varied figurines. The process differs slightly if a mixture of resin and asphalt is used. Clay is then used, instead of wax, for making the molds and designs are created with the mixture. These molds are then coated with soft clay and left in the open to dry. As the molds harden, women of the village get on with their job of putting on the final red clay coating. And another round of sunbathing follows.

These paraphernalia are followed by the important task of making a channel or pathway within the mold. It is through this channel that molten brass spreads and the dokra figurine starts taking shape. Women are entrusted the job of covering the channeled molds with red clay, which are again set out in the sun to dry. Their tender hands also add an elongated portion, to the mold, in which brasschips are kept. Locally, it is known as *Gheriya*. The brass chips are covered with a kind of cap made from red clay. To allow entry of heat, perforations are maintained along the side of the clay cap.

A fire pit is created by vertically lining bricks and the different designed molds are placed inside. The perforated side faces the fire, allowing the brass chips to melt and spread out within the mold. Once ready, the molds are taken out of the pit and carefully hammered. The cast gives away and the dokra figurine emerges in all its glory.

Paran Karmakar's narration about the birth of dokra art finished, but the surge of thrill did not ebb. I learned about a new form and also about the lives of its artisans. Bidding adieu to Dariyapur, I saluted the spirit of this village that has kept the form alive bravely facing all odds.

Koshe Kosha

Balarka Banerjee

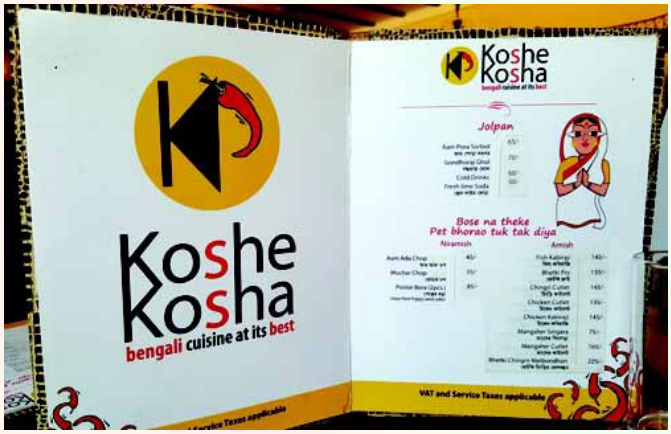

Although it's undeniable that Kolkata is as close to foodie heaven as possible, one strange conundrum remained for a very long time. Where do you go for a great Bengali meal. Sure there are several traditional "pice hotels" and "cabins" still operating, offering traditional fare. But they are mostly determinedly old school and have not kept up with the expectations of the modern diner. Although the food may be outstanding, the other aspects that make a great restaurant, such as ambience, service, presentation, are often lacking. On the other hand, the ever expanding array of well adorned, contemporary, presentable restaurants have somehow managed, for the longest time, to ignore the cuisine of the very city they are based in instead focussing on European, Chinese, North Indian, Tibetan, Thai and various other fare. However, with changing times and broadening tastes the discerning Kolkata foodie these days expects more. A lot more. As do visitors to the city, who look to enrich the trip by sampling the unique culinary offerings of the city.

Thus there has emerged a much welcome new trend, whereby a number of restaurants have popped up in all parts of the city offering a variety of local, Bengali cuisine in a trendy, contemporary restaurant. Among these is a chain of restaurants known as "Koshe Kosha" which has already garnered quite a few accolades. Therefore, we singled out the Park Street branch of Koshe Kosha to pay them a visit for lunch.

Tucked away on Ripon Street, just around the corner from the ever bustling Park Street, we walked in from the street onto striking black and white tiled floors of the restaurant. The floors reminded me of my great grandparents' house in North Kolkata. The rest of the décor seemed to match this mood quite effectively. The space had a minimalistic yet attractive quality about it. Old vinyl records and murals adorned the walls and the whole restaurant had a contemporary yet familiar feel. We were seated by courteous wait staff and started to go through the extensive and creatively worded menu. The dishes all seemed incredibly tempting, as all our favourites were there. Most of the dishes are what any average Bengali would be well familiar with. Kabirajis, cutlets, vegetarian favourites like "Potoler dorma", classics like "Macher mathadiye dal" and "Kosha mangsho". These are dishes we have all grown up loving, but rarely get to indulge in these days somehow. As a result, making any choices at all (other than the "Gondhoraj ghol" to drink) seemed daunting. Luckily, we were soon joined by one of the owners of the restaurant, Mr. Chiraag Paul, who took time out of his busy schedule to join us for lunch and introduce us to Koshe Kosha. We left most of the ordering in his capable hands and sat back to enjoy the meal. For starters we got "Bhetki chingrir mel bondhon", and "Mochar chop".

For mains we ordered 'Bhetki paturi', 'Roshun bhapa bhetki', 'Kosha mangsho' and 'Malai chingrir biriyani'. While we waited for the food Chiraag told us the story of how "Koshe Kosha" had evolved from a modest stall in Hatibagan, to eight full restaurants all over Kolkata. Chiraag himself is an interesting young man and it was a pleasure learning about the restaurant in his own words. Having spent most of his life abroad, he has fairly recently relocated to Kolkata to be more involved in Koshe Kosha and other businesses. His passion for food, his culture and the city shone through as his eyes lit up every time he spoke about either. As a result of having eight restaurants all over Kolkata Koshe Kosha is able to deliver food almost anywhere in the city, for no extra charge. It Koshe Kosha Behala was already nearing completion, and seems as though there are no plans to stop expanding to more locations, including other cities in India. Chiraag recounted to us how Koshe Kosha had taken on the responsibility to cook and serve Bolivian food at the 2016 Kolkata International Book Fair (where Bolivia was focus country this year). He talked about the challenges of cooking a completely unfamiliar cuisine with unfamiliar ingredients (such as quinoa) and then hunting down, probably the only Bolivian in all of Kolkata, to try and critique the food.

It was probably wise that we engaged in this conversation before the food arrived, because once the food hit the table there was very little being said, other than ooh's and aah's and wow's. The 'Bhetki chingri mel bondhon' was a dish I have never had before. It was made up of an excellent piece of bhetki coated in a spicy shrimp paste, then crumbed and fried. The combination of flavours was brilliant, and although it resembled the classic "fish fry" it took it to another level. The 'Mochar chop' was brilliant in quite the opposite way, as in it was traditional, pure and delicious. Likely to give you pangs of nostalgia and take you back to your college canteen days.

The mains soon followed and the same theme of combining traditional with the novel and experimental seemed to continue. The 'Bhetki pathuri' was delicate and well balanced, where the 'Roshun behtki' packed a very satisfying garlic punch. The 'Chingri malai biriyani' was another novel dish, where tiger prawns were cooked in a coconut curry and served with a biriyani. What made the biriyani so unique was that the rice itself was cooked in the prawn stock giving it an incredible richness and depth.

The 'Kosha mangsho', is their signature and with just cause. 'Kosha mangsho' (or goat curry slow cooked with almost no added water) is a common dish which has a thousand versions using different ingredients and spices. However, tasting the 'Kosha mangsho' at Koshe Kosha will remind you somehow what 'Kosha mangsho' has sense of authenticity to its taste. For me it brought back memories of a 'Kosha mangsho' that I had had almost 15 years ago. It all made sense, when Chiraag explained the 'Kosha mangsho' is cooked daily by two specialist chefs who had been brought across from the legendary "Golbari". That explained why it tasted so familiar and wonderful.

Every dish was impeccably cooked and presented. The produce was of evidently of a high quality and shone through every preparation. After that outstanding meal we were perhaps ready for a quiet afternoon siesta, in the grand Bengali tradition. But speaking of tradition, it is never acceptable to end a Bengali meal without sweets. So we enjoyed some refreshing 'Aam Doi' (sweet curd flavoured with mango) which hit the right spot.

Koshe Kosha is a restaurant very much intended for repeat visits. The pricing is affordable and excellent value. The large number of restaurants and the free home delivery make it easily accessible. The delicious food combines the old and the new very finely, and the menu contains several items that probably already have their own fan following. People who try it for the first time are most likely to leave, already planning their next

visit. I for one am sure to come back for another helping of the "Kosha mangsho"!

News

Youngest Publisher — Publishers' Guild, Kolkata

Esha Chatterjee

Introduction:

I run the publishing house, BEE Books. I love the art of making beautiful books and we publish everything from translations, fiction, non-fiction, essays to graphic novels and corporate coffee table books. We have our own team of artists, designers, editors and our very own printing press. Our team is always looking forward for new and interesting projects. We offer fee-based assistance to authors including designing, book layout, editing, publication, marketing, promotion and distribution. Just drop us a mail at query@beebooks.in with your proposal.

Apart from that, I am a book reviewer, critic, moderator for literary events and I have been associated with quite a number literature festivals.

About BEE Books:

Bee Books is all about putting forward a platter of books which you would love reading, which make you happy and give you a world to escape and live in. We believe there is no better feeling than sinking into your sofa alone and disappearing inside the world of story. Our mission is to create an entire range of books, from fiction to non-fiction, classics to popular contemporary writing, from comics to graphic novel and studio books. Through our books we hope to inspire creativity, spread awareness, bring clarity of thoughts and make people happy. Our list features best-selling, award-winning talents as well as new voices who will be stars of tomorrow. We love what we do and the passion will reflect in every book we publish

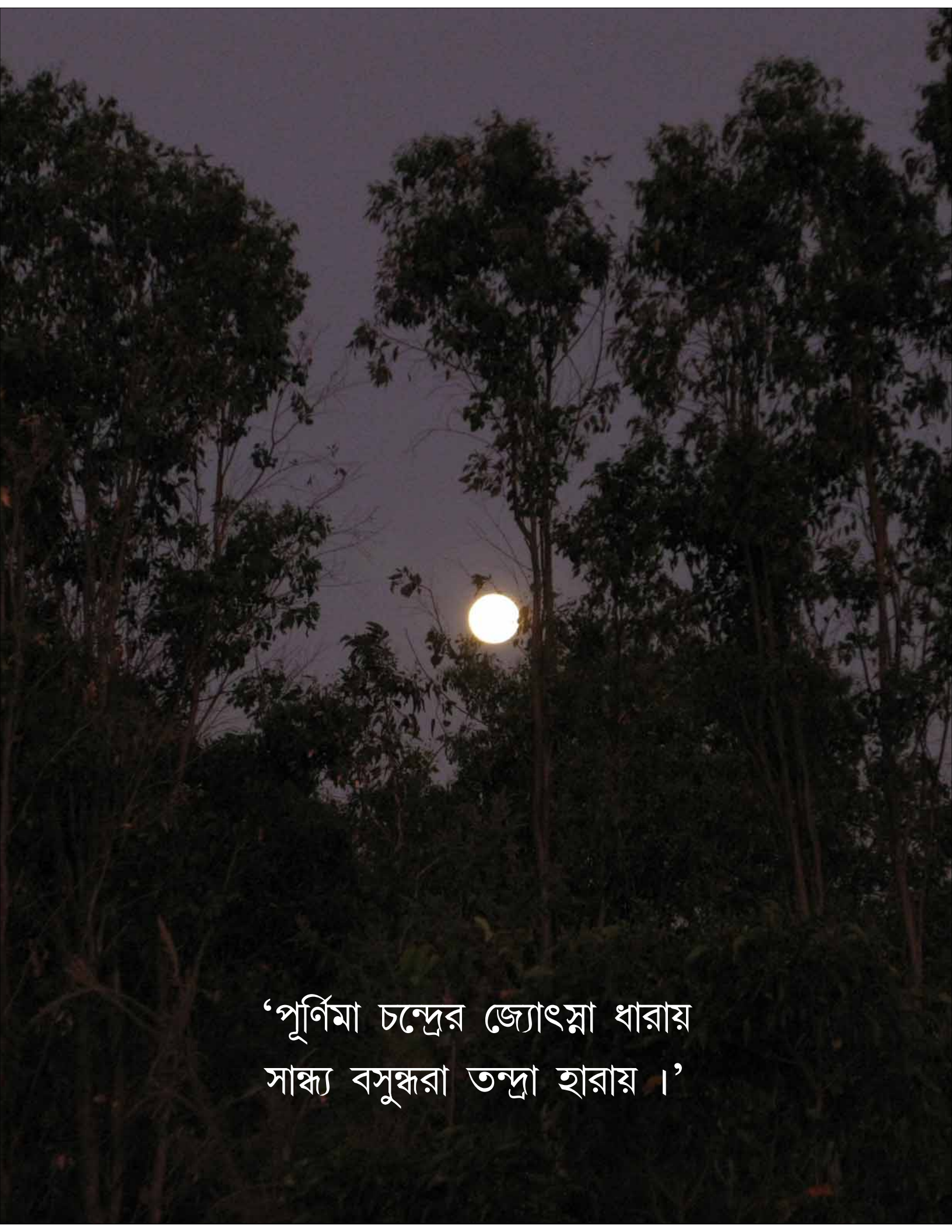

‘পূর্ণিমা চন্দ্রের জ্যোৎস্না ধারায়
সান্ধ্য বসুন্ধরা তন্দ্রা হারায় ।’